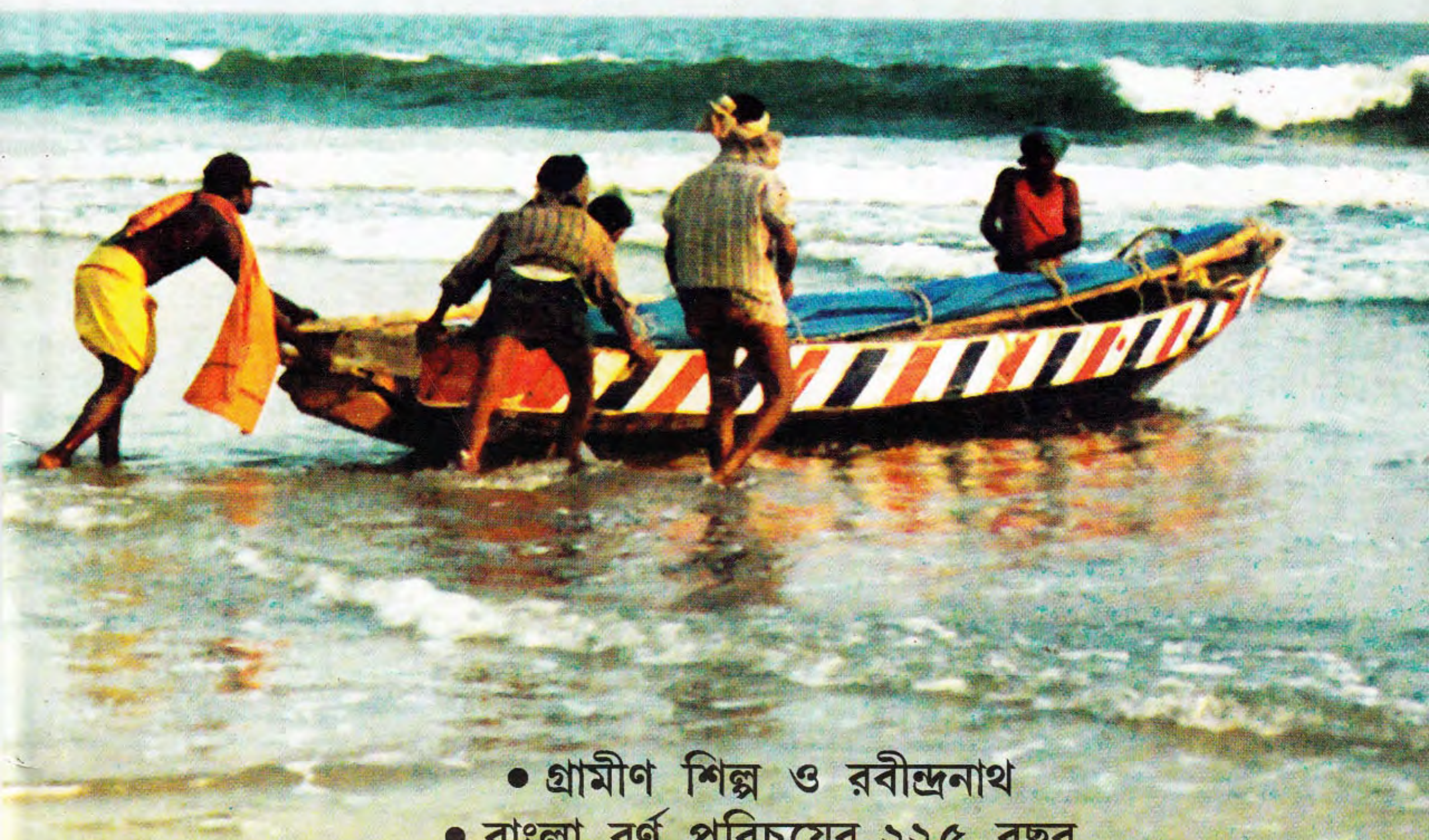
পশ্চিমবঙ্গ

অক্টোবর, ২০০৪

পর্যটন



• গ্রামীণ শিল্প ও রবীন্দ্রনাথ
• বাংলা বর্ণ পরিচয়ের ২২৫ বছর


দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন



পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মাসিক মুখপত্র

বর্ষ ৩৮ ।। সংখ্যা ৩

অক্টোবর ২০০৪

আশ্বিন-কার্তিক ১৪১১

প্রধান সম্পাদক সুখেন্দু দাস

সম্পাদক সুপ্রিয়া রায়

সহকারী সম্পাদক

মন্দিরা ঘোষাল স্মরজিৎ প্রামাণিক

সংগ্রাম গুহ সেরিনা জাহান

অনুবাদক

নির্মলেন্দু নাথ ভাস্বতী দাশগুপ্ত অমর্ত্য ঘোষাল

গৌতম চক্রবর্তী প্রসেনজিৎ মণ্ডল

অরিন্দম বসু

আলোকচিত্রী

সুমন্ত পত্রনবীশ অরিজিৎ ভট্টাচার্য অঞ্জন খান

প্রতীক শেঠ দেবাশিস ব্যানার্জি

প্রচ্ছদ সজ্জা : শুভ্র চক্রবর্তী

মূল্য পাঁচ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : একশ টাকা

সম্পাদকীয় শাখা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

মহাকরণ (চতুর্থ তল)

কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ ২২১৪-৩০১১

২২১৪-৫৬০০

(এক্স-৪৭১০)

বিতরণ শাখা

সফ্দর আলি খান

বিজনেস ম্যানেজার

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ ২২৪৩-৬২৯৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

পর্যটন শিল্পের বিপণনে আরও গুরুত্ব প্রয়োজন

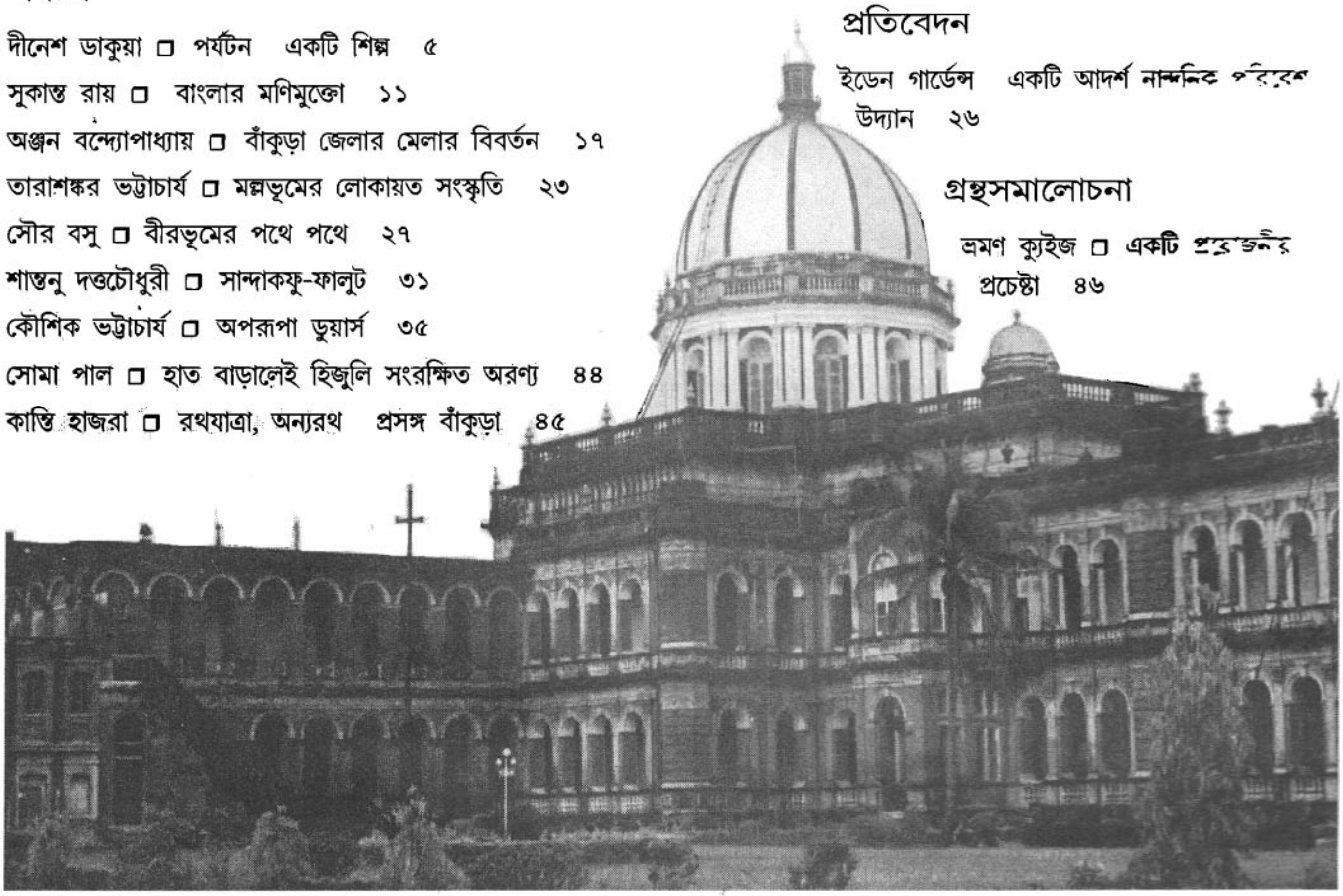
চিত্তসম্পদের মূল্যবান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তোলে পর্যটন। তাই পর্যটনের বিকল্প পর্যটনই। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপটে একসময় কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষ। ভেবেছিলেন, অনেকে বুঝি ঘরকুনো হয়ে পড়বেন। টিভির পর্দাতেই মেটাবেন বিশ্বদর্শনের স্বাদ। কিন্তু বাস্তব আজ অন্য কথাই বলছে। মানুষ এখন আরও পর্যটনমুখী। যত বেশি তাঁরা পড়ছেন, জানছেন, দেখছেন ততই তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। আজ তাঁরা ভ্রমণবিলাসীই নন, পর্যটনের প্রকৃত স্বাদ পেতেও মরিয়া। শিক্ষার বিস্তার, তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা, সরকারি ও বেসরকারিভাবে পর্যটন-সংক্রান্ত সাংগঠনিক উদ্যোগ, সর্বোপরি পর্যটন শিল্পের আধুনিকীকরণ সর্বস্তরের মানুষকে পর্যটনে উৎসাহিত করছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটনস্থল। এই রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী। পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে রাজ্যে সম্প্রতি যে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে, পর্যটন শিল্পের বিকাশের গতিকে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবে এই আশাই স্বাভাবিক। বিদ্যুৎ, জল, রাস্তাঘাট, যানবাহন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই চলছে উন্নয়ন। অন্যদিকে, সুষ্ঠু ও সফল পঞ্চায়েত এবং পৌরব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম-শহর সর্বত্র স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং বিকাশের মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের কাজ চলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে পর্যটন শিল্পে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ্যের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ভ্রমণবিন্দু। সেইসব ভ্রমণবিন্দুর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিমেয়। নতুন প্রজন্মের কাছে রাজ্যের এই ঐতিহ্য নতুন করে তুলে ধরতে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যটন যেহেতু একটি পরিষেবামূলক শিল্প, তাই বিশেষভাবে এই শিল্পের বিপণনের পদ্ধতির বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। পর্যটন-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে এই সংখ্যায়। পর্যটন সংক্রান্ত নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনগুলিতে। এই সংখ্যায় দুটি মূল্যবান নিবন্ধও প্রকাশিত হল। প্রতিটি লেখাতেই লেখকের মতামত নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গ

অক্টোবর ২০০৪

বিষয়সূচি



প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রথম প্রচ্ছদ	দীঘা	
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	সুন্দরবন □ ছবি	দেবাশিস ব্যানার্জি
তৃতীয় প্রচ্ছদ	অশোকনগর মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক □ ছবি	প্রতীক শেঠ
চতুর্থ প্রচ্ছদ	সান্দাকফু থেকে □ ছবি	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গা পত্রিকার (বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি)

গ্রাহক এবং এজেন্ট হবার জন্য যোগাযোগ করুন

সফ্দর আলি খান, বিজনেস ম্যানেজার, বিতরণ শাখা

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ ২২৪৩-৬২৯৫

সংবাদ

পরিবেশ রক্ষা করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব নয় মুখ্যমন্ত্রী

বন্যপ্রাণী নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সক্রিয় হতে হবে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আগের থেকেও কঠোর আইন গ্রহণ করা হচ্ছে। আইনি ব্যবস্থাকে দ্রুত কার্যকরী করতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে দুটি বিশেষ আদালত গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ৬ অক্টোবর ২০০৪-এ ভারতীয় যাদুঘরের আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে বন্যপ্রাণ সপ্তাহের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একথা বলেন। এবছর ৬ থেকে ১২ অক্টোবর বন্যপ্রাণ সপ্তাহ পালিত হয়। বন্যপ্রাণ আইন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আইন কড়া না হলে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। বন বিভাগ আইনের সংযোজনী অংশের খসড়া তৈরি করে ফেলেছে। আইন বিভাগ ওই খসড়া খতিয়ে দেখছে। সুন্দরবন, ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের বনরক্ষা ও বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি) সুন্দরবনের অরণ্য, পশুপাখি রক্ষার কর্মসূচিতে সাহায্য করবে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন এলাকার মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন। সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশ মানুষই নিম্নবিত্ত। নিম্নবিত্ত মানুষের উন্নয়ন করতে না পারলে অরণ্যরক্ষা ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করা যাবে না।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাতির যাতায়াতের করিডোর নষ্ট করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে হাতির খাবার পাওয়া যায় এমন নিশ্চিত বনাঞ্চল তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, জলপাইগুড়িতে জাতীয় সড়ক চওড়া করার প্রস্তাব এসেছে। সেখানে নতুন সড়ক তৈরির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও রয়েছে। রাজ্য সরকার হাতি যাতায়াতের রাস্তার ক্ষতি না করে সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করবে। ডুয়ার্স এবং তরাইয়ে একটি করে চা পর্যটন কেন্দ্রও তৈরি করা হবে। সেখানে পর্যটকরা অরণ্য-পাহাড় ও চাবাগানের সৌন্দর্য একসঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, আলিপুর চিড়িয়াখানা অন্যত্র সরানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ। তিনি জানান, বন্যপ্রাণ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা কলকাতায় হলেও চিলাপাতায় তোর্সা নদীর ধারে একটি অনুষ্ঠান হবে। তবে শুধু সরকারের পক্ষে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন সংরক্ষিত বন এলাকায় ১৯৮টি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এখন বন সুরক্ষা কমিটিতে ৪৩ হাজারের বেশি পরিবার যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও বন সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে আসছে।

বন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিনের অনুষ্ঠানে বলেন, বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্য দিয়ে বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে যাদুঘর প্রাঙ্গণে বাঘের চামড়া, হাতির দাঁত ও বন্যপ্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে বন্যপ্রাণ সপ্তাহের সূচনা করা হয়। বন্যপ্রাণী হত্যা ও বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে এই প্রতীকী আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য বন বিভাগ।

বন্যপ্রাণ সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যে কতটা জরুরি তা অনুধাবন করা। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে বলা যায়, আমাদের রাজ্যে বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য ক্রমবর্ধমান পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম উপাদান। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিক উচ্চতার অরণ্য থেকে জলপাইগুড়ি জেলার হিমালয়ের কোলে বিস্তৃত বনভূমি, আবার দক্ষিণে সমুদ্রের খাঁড়িতে অবস্থিত সুন্দরবনে রয়েছে বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী, কীটপতঙ্গ, লতাগুল্ম, উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি। পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলিতে রয়েছে অতিবিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণসমূহ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, একশৃঙ্গ গন্ডার, হাতি, কৃষ্ণসার, নানা প্রজাতির হরিণ, খাঁড়ির কুমির, কচ্ছপ (অলিভ রিড্‌লে ও বাতাগুড় বাক্‌সা), সোনালি মুখের হনুমান, নানা প্রজাতির বনবিড়াল, হিমালয়ের রেডপান্ডা ও নানা প্রজাতির পাখি, যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য বেঙ্গল ফ্লোরিকান প্রভৃতি।

২০০২-এর ব্যাঘ্র গণনা অনুযায়ী রাজ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ৩৪৯। যার মধ্যে সুন্দরবনের বাঘ ২৪৫। ১৯৭২ সালে রাজ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিল মাত্র ৭৩টি। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে সুন্দরবনে যে ব্যাঘ্র সুমারি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭৪। বর্তমানে রাজ্যে একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা ৯৬। এই অতিবিরল প্রজাতির প্রাণীটির আবাসস্থল জলদাপাড়া ও গরুমারার অরণ্য। অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর মধ্যে চিতাবাঘের সংখ্যা ৩৩১ ও বাইসন (ইন্ডিয়ান গাউর) ১২৬১, যা মূলত দেখা যায় উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশের বনাঞ্চলগুলিতে। এছাড়া হাতির সংখ্যা ৩২৮ (যার মধ্যে ৩৬টি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের), সম্বরে ১২১৬, চিতল হরিণ ১৯৭৯, হগ ডিয়ার ২২৬১, বার্কিং হরিণ ৩৯৬০, বন্য শূকর ৭৩৫৪ এবং হিমালয়ের কালো ভাল্লুক আছে ৬৫টি।

১৯৫২ সালের জাতীয় বননীতি অনুযায়ী সমস্ত রকমের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় এই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে এবং যার ইতিহাসের সূত্রপাত গত শতাব্দীর চারের দশকে সেঞ্চল ও জলদাপাড়াকে অভয়ারণ্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে আরো অনেক বনাঞ্চলকে এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৫টি অভয়ারণ্য, ২টি ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ৫টি জাতীয় উদ্যান আছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা অরণ্যের আয়তন বর্তমানে ৪০৩১ বর্গকিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র অরণ্যের আয়তন ১৩,৫৮১ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা বনভূমি রাজ্যের মোট বনভূমির শতকরা ৩৪ ভাগ। এছাড়া রাজ্যের জলাভূমিগুলি সংরক্ষণের জন্য বন বিভাগ পৃথক একটি গবেষণা শাখা তৈরি করেছে।

বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে হবে   মুখ্যমন্ত্রী

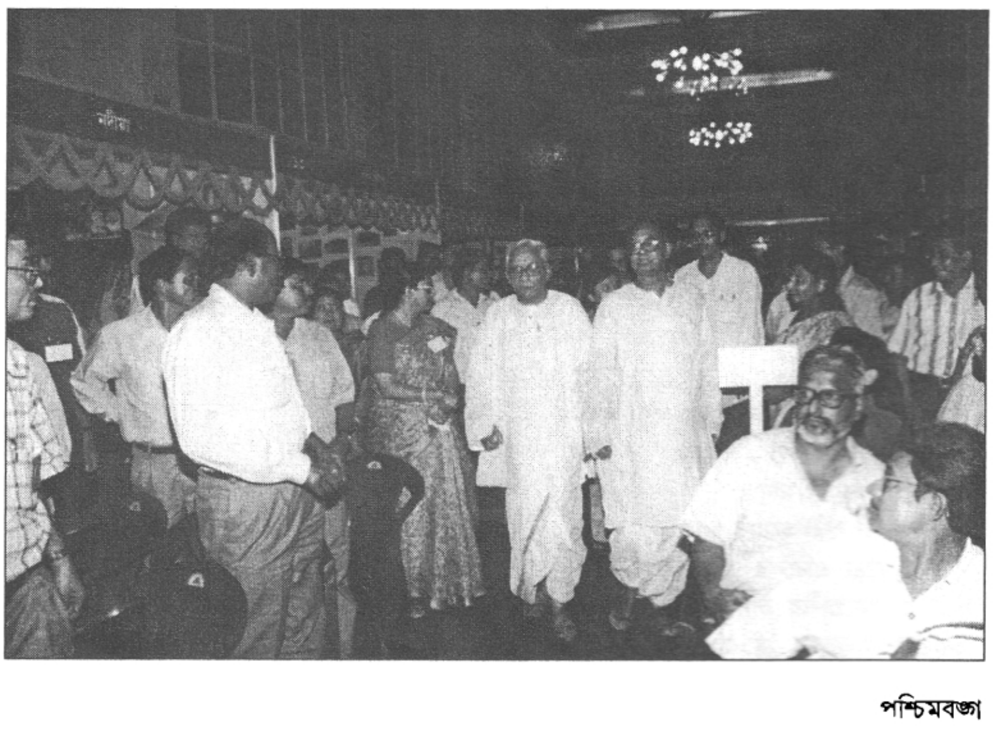
বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে রাজ্যে তিনটি পর্যটন কেন্দ্র বিশেষভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দরবার হলে চারদিব্যাপী একটি পর্যটন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গের চা বাগান অঞ্চল, দীঘা ও শঙ্করপুরের সমুদ্র সৈকত এবং সুন্দরবনে এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি করা হবে।

তিনি আরো বলেন, পর্যটন এমন একটি শিল্প যেখানে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। তাই এইসব পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বিদেশি পর্যটকদের রাজ্যে আকর্ষণ করার বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, গত বছর ৮৮ লক্ষ বিদেশি পর্যটকের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ পর্যটক এ রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি সরকারি হোটেল ও ট্যুরিস্ট লজগুলির পরিচালন ব্যবস্থা বেসরকারি হাতে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের কথাও জানান।

পর্যটনমন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া বলেন, রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরার জন্যই এই পর্যটন প্রদর্শনীর আয়োজন উল্লেখ্য, পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেলাগুলির পর্যটনস্থলগুলিকে তুলে ধরা হয়।



৯ সেপ্টেম্বর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পর্যটন প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

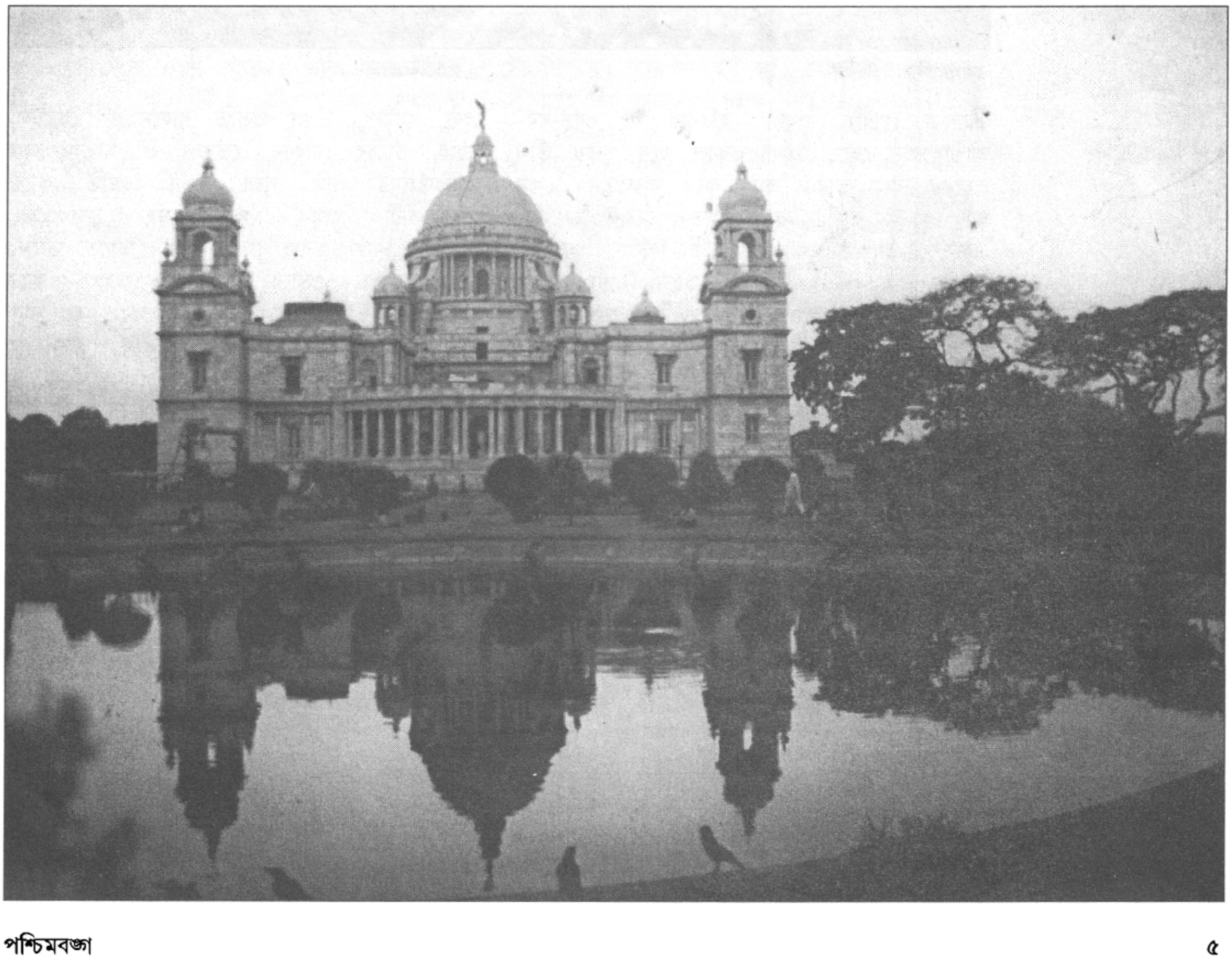


উক্ত প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং পর্যটন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া
ছবি অরিজিৎ ভট্টাচার্য

পর্যটন একটি শিল্প

দীনেশ ডাকুয়া

কবে সেই বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে শোকোন্মত্ত শিবের ঘাড়ে অবস্থিত পার্বতীর দেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গোটা ভারতের ৫১টি স্থানে পড়ে আসমুদ্র হিমাচলের ৫১টি জায়গায় ৫১টি পবিত্র ভূমি বা পীঠস্থানের সৃষ্টি করেছিল, সেই থেকে গোটা ভারতবর্ষের পুণ্যাকাঙ্খী আমজনতা ৫১টি পীঠস্থানকে ৫১টি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এবং প্রতি বছর নানা ক্লেশ সহ্য করে সেই তীর্থ দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করে এসেছে। পৌরাণিক গল্পটা যাই হোক না কেন, এর প্রত্যেকটি স্থান কিন্তু পাহাড়, অরণ্য, মরুভূমি, নদীতীর। নানা কারণে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর। তখন প্রকৃতি পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজম বলে কোনো ধারণার সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু এই তীর্থ পর্যটনের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি পর্যটনের প্রশস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেই সুদূর অতীত থেকেই ভারতের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ পিতৃতর্পণ উপলক্ষেই হোক বা কোনও উপলক্ষ ছাড়াই হোক নিতান্ত পুণ্যার্জনের জন্য পাণ্ডা ঠাকুরদের হাত ধরে দলে দলে গয়া, কাশী,





রকগার্ডেন, দার্জিলিং

শ্রীক্ষেত্র (পুরী), প্রয়াগ, হরিদ্বার বা বাড়ি-ঘর-আত্মীয়স্বজন ছেড়ে মাসাধিককাল ধরে পুষ্কর তীর্থ ভ্রমণের নামে ভারত ভ্রমণ করে থাকতেন। তখন আধুনিক ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্ট ছিল না। এই পাণ্ডা ঠাকুররাই অর্থ ও ভক্তির বিনিময়ে সে কাজ করতেন। এমনও দেখা গেছে, কোনো বিশেষ পাণ্ডার ঘরে যদি কারও বাপ-ঠাকুর্দা অতীতে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, খাতাপত্র বার করে বর্তমান তীর্থযাত্রীকে সেই পূর্বপুরুষ সূত্রে সনাক্ত করে তাঁর ঘরেই অতিথি হবার জন্য দাবি করতেন এবং অনেক সময় পাণ্ডাদের মধ্যে বিতণ্ডা শেষে তাই করতে বাধ্য করতেন। অর্থাৎ ট্রাভেল এজেন্টের ব্যবসাটা সে সময়েও জোরদার ছিল এবং তাতে বেশ শক্ত ব্যবসায়িক কায়েমি স্বার্থও গজিয়ে উঠেছিল। সে যাই হোক এই পর্যটন ব্যবসায়ী পাণ্ডা ঠাকুরদের মাধ্যমে ভারতের আপামর জনতার কমপক্ষে পর্যটনটা সম্পন্ন হত। মথুরা, বৃন্দাবন বা পুষ্কর দেখতে গিয়ে এঁদের আগ্রার তাজমহলটাও দেখা হয়ে গিয়েছিল বা দিল্লির কুতুবমিনারটাও বাদ যেত না। কালীঘাট দেখতে গিয়ে লোকে ইংরেজ আমলে সৃষ্ট কলকাতাকেও বাদ দিতেন না। পুরীতে গিয়ে শুধু জগন্নাথ দর্শন নয়, সমুদ্রের অভিজ্ঞতাটা, হরিদ্বারে গিয়ে পাহাড়ের অভিজ্ঞতাটা, সমতলবাসী মানুষ অহরহই সঞ্চয় করতেন। বাড়ি থেকে কোমরে থলেতে করে টাকা নিয়ে গিয়ে যে অর্থ তাঁরা ভ্রমণ করতে করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আসতেন, সারা ভারতের রেল, মোটর, রিক্সা প্রভৃতি বাহনেরও, হোটেল, সরাই, চায়ের দোকান, ভোজন ও অতিথিশালার কর্মকর্তাদের প্রতি পূজা তর্পণ প্রভৃতি কাজে সাহায্যকারী বামুন, পুরোহিতসহ ফুলওয়ালা, নৈবেদ্যওয়ালারাও বাদ যেতেন না, তাতে তাঁদের পরিবার চলত। এভাবে তীর্থস্থানকে অবলম্বন করে নানা ব্যবসা বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং নানা মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত। তীর্থ পর্যটনে শুধু ধর্মই নয়, আর্থিক দিকটাও ছিল।

কালক্রমে শুধু তীর্থ নয়, ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ ঐতিহাসিক স্মারক সৌধগুলি পর্যটনের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দিতে লাগল। ধর্মীয় পর্যটনের পাশাপাশি ঐতিহাসিক পর্যটনও স্থান করে নিল। আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুবমিনার, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, অক্টারলোনি মনুমেন্ট, হাওড়ার স্তম্ভবিহীন সেতু, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর এবং আরও পুরোনো দিনের মুর্শিদাবাদ, গৌড় প্রভৃতি মানুষের পর্যটন সম্ভারের তালিকায় জায়গা করে নিল। দেরাদুন, দার্জিলিং, সিমলার মতো ধর্মনিরপেক্ষ শৈলাবাসগুলি, কেরালা, গোয়া, এমনকী দীঘার মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিগুলি, আরও পরে গুজরাটের গির, পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও সুন্দরবনের মতো অরণ্য ও বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত অভয়ারণ্যের দিকে মানুষের নজর গেল। অরণ্যের শান্তি উপভোগ করতে লাগলেন তাঁরা। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষতবিক্ষত মনকে দিনের

সে যাই হোক এই পর্যটন ব্যবসায়ী পাণ্ডা ঠাকুরদের মাধ্যমে ভারতের আপামর জনতার কমপক্ষে পর্যটনটা সম্পন্ন হত।

পর দিন নির্জন অরণ্যের শান্ত পরিবেশে তাঁরা শান্ত হয়ে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, কেরালার ওনাম, গুজরাটের নবরাত্রি, কলকাতার দুর্গাপূজা, শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে যোগ দেবার ও সংস্কৃতির ভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করার জন্যও দেশ-বিদেশের মানুষ আসতে লাগলেন।

এভাবেই ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির পর্যটনের চলন হতে থাকল। সবগুলিই এখন চলছে। তবে এখনও নাকি পৃথিবীর পর্যটকদের সংখ্যার একটি বড়ো অংশই ধর্মীয় পর্যটকেরাই দখল করে রাখেন।

পর্যটন একটি শিল্প। কারণ এর সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য, আয়, ব্যয়, লাভ-লোকসানের ব্যাপার জড়িত। তবে এটা মূলত পরিষেবামূলক শিল্প। পর্যটকরা প্রধানত চান যানবাহনের সুব্যবস্থা, অর্থাৎ রেল, মোটর, নৌকা, জাহাজ, রিক্সা, অটোরিক্সা প্রভৃতি যেখানে যা দরকার। যাঁরা বেশি ব্যয় করতে পারেন ও করেন পর্যটনের ভাষায় তাঁদের হাই এন্ড (High end) ট্যুরিস্ট বলা হয়। তাঁরা সুযোগ পেলেই উড়োজাহাজে যাতায়াত করেন। তাঁরা বেশির ভাগই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ভ্রমণ করেন। তারা আন্তর্জাতিক পর্যটক। আসলে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশইতো ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো আর বৈচিত্রপূর্ণ নয়। সেজন্য নিজেদের ছোট্ট দেশ তাঁদের অল্পদিনের মধ্যে দেখা হয়ে যায়। তাতে তাঁদের মন ভরে না। নিজেদের ভ্রমণ পিপাসা মেটাবার জন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁদের অন্য দেশেও যেতে হয়। তবে যে দেশের কোনও অংশের মানুষ ভাত কাপড় যোগাতে পারেন না তাঁদের পক্ষে ভ্রমণ অবশ্যই আশা করা যায় না। অবশ্য ধন সম্পত্তিহীন এক রকমের লোক আছেন। তাঁরা সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কথা আলাদা। আমরা সাধারণ ঘর গৃহস্থালি করা মানুষের কথা বলছি। সেজন্য ইউরোপ আমেরিকার লোকে বেশি ভ্রমণ করেন। সম্ভবত সংসার চালিয়ে তাঁরা কিছু বাড়তি অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন।

পরিবহন যানবাহন ছাড়া আর যে জিনিসটির অবশ্য প্রয়োজন পর্যটকদের কাছে, তা হল আবাসন বা হোটেল। বিভিন্ন অবস্থায় পর্যটকদের অবশ্য বিভিন্ন মানের হোটেল দরকার। ধর্মস্থান, ঐতিহাসিক বস্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি যার আকর্ষণে পর্যটকরা আসেন, তাকে বলা হয় পর্যটন সম্ভার (Tourist Product) আর সেই স্থান হয় গন্তব্য স্থান (Tourist destination)। এই পর্যটন সম্ভারে পরিপূর্ণ গন্তব্য স্থানই পর্যটন শিল্পের আদর্শ পর্যটনের বাজার। সে সৌভাগ্য সব জায়গায় হয় না। ইচ্ছে করলেই সব জায়গাতে তা বানানোও সহজ নয়।

পর্যটকরা যে যে পর্যটন সম্ভারের আকর্ষণে যে যে পর্যটন গন্তব্যস্থলে আসেন, সে সমস্ত কিন্তু কখনও



তিস্তায় র‍্যাফটিং

পর্যটন একটি শিল্প। কারন এর সঙ্গে ব্যবসা, বানিজ্য, আয়, ব্যয়, লাভ-লোকসানের ব্যাপার জড়িত। তবে এটা মূলত পরিষেবামূলক শিল্প।

প র্য ট ন



দীঘার সৈকত

পর্যটককে দেখাবার জন্য বা পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য তৈরি হয়নি। তৈরি হয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে যা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে বিশেষ কারণে। তারপর দেশ বিদেশের পর্যটকরা তা দেখতে আসছেন। যেমন, শাহজাহান তাজমহল তৈরি করেছেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে। সে সৌধটা সুন্দর হয়েছে, বিরাট হয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে। তারপর দেশ বিদেশের পর্যটকরা তা দেখে তৃপ্তি লাভ করেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা কেউ তৈরি করেননি—প্রকৃতির খেয়ালে তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু মানুষ তা দেখে তৃপ্তি পাচ্ছেন, শান্তি পাচ্ছেন।

নিতান্ত মানুষকে দেখানোর জন্যও কোনও কোনও পর্যটন সম্ভার তৈরি হয়েছে। লন্ডনের মাদাম তুসোর ভাস্কর্য সংগ্রহশালা ও সিঙ্গাপুরের জলজগৎ (Marine world) তার উদাহরণ। কলকাতার নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটিও একই পর্যায়ে পড়ে। সেজন্য প্রাকৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক পর্যটন সম্ভার যা আছে, আছে, তাছাড়াও কৃত্রিম পর্যটন সম্ভার তৈরি করে অনেকে পর্যটক আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। কারণ ব্যবসাই বলুন, আর শিল্পই বলুন, বর্তমানে অর্থনৈতিক কাজকর্মে পর্যটনের স্থান যথেষ্ট উঁচুতে।

নিতান্ত মানুষকে দেখানোর জন্যও কোনও কোনও পর্যটন সম্ভার তৈরি হয়েছে। লন্ডনের মাদাম তুসোর ভাস্কর্য সংগ্রহশালা ও সিঙ্গাপুরের জলজগৎ (Marine world) তার উদাহরন। কলকাতার নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটিও একই পর্যায়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ একটি দেশ হলেও এর রাজ্যগুলি পর্যটন গন্তব্য হিসাবে প্রত্যেকটি আলাদা। সেজন্য দেশ হিসেবে বিদেশি পর্যটক টানার চেষ্টা অবশ্য ভারত সরকার কম বেশি করে চলেছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত তার ট্যুরিস্ট অফিসগুলির মাধ্যমে। তবে চেষ্টা যথেষ্ট নয় ও প্রতিযোগিতায় অন্য দেশের সঙ্গে তুলনীয়ও নয়। অনেকটা সে কারণেই বৈচিত্রে ভরা হলেও ভারত তেমনভাবে বিদেশি পর্যটক টেনে বিদেশি অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। বিশ্বের ৬৯২৭.০০ লক্ষ আন্তর্জাতিক পর্যটকের মধ্যে ভারতের অংশ ২৭.৩৭ লক্ষ জন অর্থাৎ ০.৩৯% শতাংশ। অথচ ভারত পর্যটন সম্ভারে ভরপুর। প্রচারের অভাবটাই এর প্রধান কারণ। ভারতের মধ্যে এরাজ্য থেকে ও রাজ্যে অথবা একাই রাজ্যে এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায় পর্যটকদের যাতায়াত আছে। তাঁদের অভ্যন্তরীণ (Domestic) পর্যটক বলা হয়। এ সংখ্যাটা ভারতের বেলায় ২৩৪.০০ লক্ষ জন। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়েছে ৪৯.৪৩ লক্ষ জন—২১% অংশ। সংখ্যাটা যথেষ্ট কম। কিন্তু পশ্চিমবাংলার অধিবাসী পর্যটকের সংখ্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ পর্যটকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক। পর্যটন ব্যবসায়ে পশ্চিমবাংলা খুব মার খাচ্ছে এটা স্পষ্ট। এখানেও কারণটা একই, প্রচারের অভাব। হয়তো বাংলার মানুষের খাওয়া পরার বা অন্য ব্যবস্থা মোটামুটি থাকতে পর্যটন ব্যবসাকে আয়ের উৎস হিসাবে পশ্চিমবাংলার সরকার ও মানুষ কোনওদিন সেভাবে ভাবেনি। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় তাই অন্যান্য রাজ্যের আক্রমণাত্মক (Aggresive) মার্কেটিং-এর কাছে পশ্চিমবাংলার পর্যটন মার্কেটিং অত্যন্ত মিনমিনে। আজকাল না হয় সরকারের টাকা নেই, কিন্তু যখন টাকা ছিল তখনও তো বিশেষ চেষ্টা



বাংলার টেরাকোটা

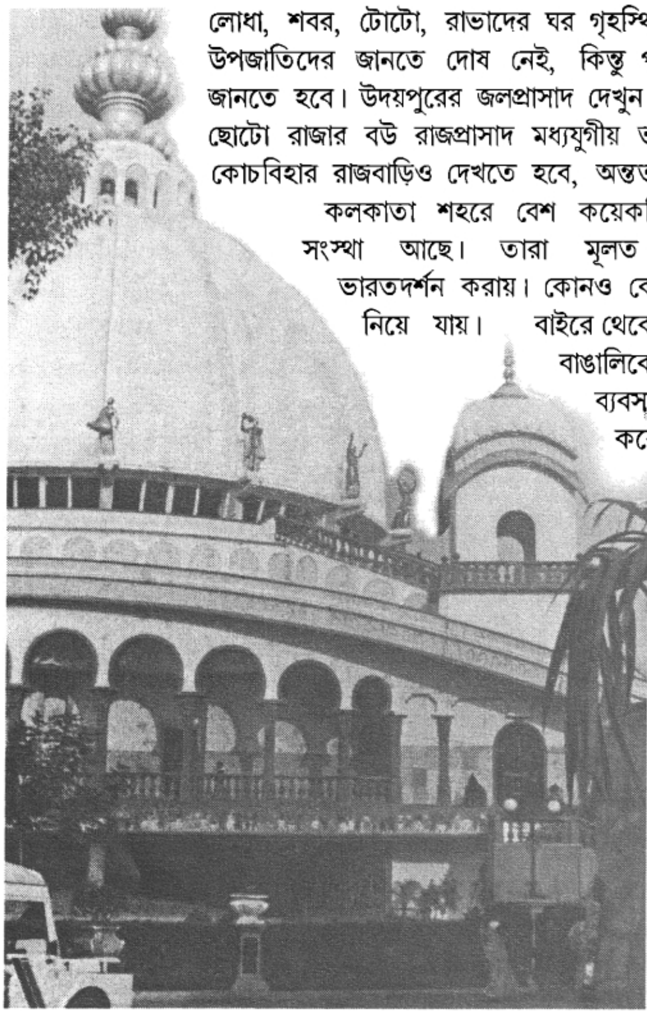
হয়নি। তার খেসারত আজ ভুগতে হচ্ছে। কলকাতা আর দার্জিলিং ছাড়া আর কোনও পর্যটন গন্তব্যের নাম পৃথিবীর দূরের কথা ভারতবাসীই জানেন না। অথচ পর্যটন শাস্ত্রের হিসাবে পশ্চিমবাংলাকে একটি পরিপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য বলা যায়। কারণ এখানে পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, নদী ও হ্রদ প্রভৃতি ধর্মীয় পর্যটন সম্ভার মুর্শিদাবাদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোচবিহার রাজপ্রাসাদের মতো ঐতিহাসিক পর্যটন সম্ভার ও কলকাতার দুর্গোৎসব, শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবের মতো সাংস্কৃতিক পর্যটন সম্ভার পশ্চিমবঙ্গে আছে ও দিন দিন তা বাড়ছে। বলতে গেলে একজন পর্যটক যা যা দেখতে ও উপভোগ করতে চান সবই পশ্চিমবঙ্গে আছে। শুধু তা মেলে ধরা হয়নি।

তাই সব রকম পর্যটক আকর্ষণের ও তাঁদের পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করার সময় পশ্চিমবাংলার এসেছে। গ্রামের মেলাগুলিতে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষ অবশ্য ছেলেপুলে নিয়ে আজকাল ভালো সংখ্যায় যোগদান করছেন ও সাধ্যমতো খরচপত্রও করছেন। তবে সাধারণত তারা রাত কাটাচ্ছেন না। বিশেষত আজকালকার ভালো যানবাহনের কল্যাণে। সেজন্য এই মেলা পর্যটকেরা পর্যটন শাস্ত্রে পর্যটক নন। পর্যটক সংখ্যার মধ্যে এঁদের ধরা হয় না। সে যাই হোক ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে এঁদের অবদানও কম নয়। সেজন্য লোকে রাত কাটান আর না কাটান, বিষ্ণুপুর মেলা, কোচবিহারের রাসমেলা প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারকে নজর দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে চুক্তি ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের তার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা অর্থ বিনিয়োগ করবেন ও টোল আদায়ের মাধ্যমে তা তুলেও নিতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ভাষায় তাঁদের পর্যটক বলে স্বীকার করুক আর নাই করুক, বাস্তব অবস্থার খাতিরে এই মেলাগুলিকেও পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে না এনে উপায় নেই। রাত না কাটালেও, এই মেলায় যোগদানকারীদের আমরা লোকাল ট্যুরিস্ট বলতে পারি। দেশের ভেতরেই যাঁরা পর্যটন করেন তাঁদের বলা হয় অভ্যন্তরীণ পর্যটক (Dometic tourist) কিন্তু একই রাজ্যের ভেতরে যাঁরা পর্যটন করেন, তাঁদের আলাদা কোনও সংজ্ঞা নেই। পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গবাসীদেরই বাংলা দেখানোর আবশ্যকতা যথেষ্ট, সে কারণে রাজ্যের ভেতরের পর্যটকদের আমরা আঞ্চলিক পর্যটক (Regional tourist) নাম দিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের বেলায় এ রাজ্যের অর্থনীতির স্বার্থে এঁদের গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ বাঙালিরা হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী দেখেছেন, কিন্তু ঘরের কাছে ডুয়ার্সের অরণ্য, খোসবাগে সিরাজের সমাধি, বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ, গড় পঞ্চকোটের পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশ দেখা হয়নি। জানা হয়নি

লোকে রাত কাটান আর না কাটান, বিষ্ণুপুর মেলা, কোচবিহারের রাসমেলা প্রভৃতির উন্নতির জন্য সরকারকে নজর দিতে হবে।

লোধা, শবর, টোটো, রাভাদের ঘর গৃহস্থির খবর। উটির ডোডা উপজাতিদের জানতে দোষ নেই, কিন্তু পাশের বাড়ির এদেরও জানতে হবে। উদয়পুরের জলপ্রাসাদ দেখুন তাতে দোষ নেই কিন্তু ছোটো রাজার বউ রাজপ্রাসাদ মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন কোচবিহার রাজবাড়িও দেখতে হবে, অন্তত বাঙালিকে।

কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি নামি দামি পর্যটন সংস্থা আছে। তারা মূলত বাংলার পর্যটককে ভারতদর্শন করায়। কোনও কোনও সংস্থা বিদেশেও নিয়ে যায়। বাইরে থেকে বাংলায় আনার বা বাঙালিকেই বাংলা দেখাবার ব্যবসা তারা বড়ো একটা করে না। প্রচণ্ড প্রচার ও স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় কেরালা, গোয়া, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে উঠেছে। দেরিতে হলেও এবং পর্যটন সম্ভারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকলেও সম্প্রতি সেখানকার সরকারের ও পর্যটন ব্যবসায়ী-দের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাইরের মানুষের তারা নজর টানতে পারছে। হিমালয়ের উপর অবস্থিত কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, নেপাল মায় দার্জিলিং পর্যন্ত প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। পর্যটকদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে পারলে এদের পুরোনো বাজার অবশ্যই বজায় থাকবে। সম্প্রতি পাহাড়ি রাজ্য সিকিম প্রচণ্ড প্রচারের মাধ্যমে অন্য সব পাহাড়ি রাজ্যের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এখনও পর্যন্ত মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নিতে পারেনি। রবি ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’র সুবাদে শিলং শিক্ষিত বাঙালির কাছে সুপরিচিত। আগে দার্জিলিং-এর পরে শিলং-এর স্থান ছিল। অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি রাজ্যগুলি সত্যিই দেখার মতো। কিন্তু কিছুটা জঙ্গি তৎপরতার কারণে, অনেকটা প্রচারের অভাবে এখনও এই সমস্ত জায়গায় পর্যটকদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। সম্প্রতি বিদেশ দপ্তরের বিধিনিষেধ কিছু কিছু শিথিল হওয়াতে এইসব জায়গায় পর্যটক বাড়ছে।



ইসকনের মন্দির, মায়াপুর

শুধু রাজ্য সরকারগুলি এবং ভারত সরকার সাহায্য করলেই হবে না, এলাকায় পর্যটন শিল্প বলে একটা শিল্প গড়ে উঠতে হবে।

অবশ্য বিদেশি পর্যটকের কাছে বাংলাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলটা একটাই প্যাকেজ। কলকাতা বিমানবন্দর তাঁদের প্রবেশ পথ। কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দরে বিদেশি বিমান ওঠা-নামা ভারত সরকার কমিয়ে দেওয়াতে এলাকাটা বিদেশিদের কাছে তেমন সহজগম্য হয়ে উঠতে পারছে না। বিদেশিদের দিকে তাকাতে গেলে বাংলা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একটি প্যাকেজে আনতে হবে এবং কলকাতা বিমান-বন্দরকে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক করে তুলতে হবে।

আর অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের কথা ভাবলেও, পাহাড়ের মানুষের সমুদ্র দেখার ও সমুদ্র পারের মানুষের পাহাড় দেখার আকর্ষণ আছেই। সেভাবেও অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্ত এলাকাটার অর্থনীতিকে সাহায্য করা যায়। তবে তার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা, প্রচার ও ভারত সরকারের পর্যটন ও অসামরিক বিমান দপ্তরের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

শুধু রাজ্য সরকারগুলি এবং ভারত সরকারের সাহায্য করলেই হবে না, এলাকায় পর্যটন শিল্প বলে একটা শিল্প গড়ে উঠতে হবে। মানুষের জন্মগত সৌন্দর্যকে যেমন পোশাক-আশাক, অলংকারাদি দিয়ে আরও ফুটিয়ে তুলতে হয় তেমনি প্রাকৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক পর্যটন সম্ভারগুলিকেও নানা অলংকরণে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। তার জন্য চাই টাকা। কে দেবেন সেই টাকা? পর্যটকরাই দেবেন। পর্যটকরা সাধারণত সমাজের একটু সচ্ছল অংশের মানুষ। তাঁদের ন্যায্য অর্থ দিতে আপত্তি নেই। সেজন্য ব্যবসায়ীরা যদি পর্যটন সম্ভারগুলিকে সুন্দর ও সুগম্য করে তোলেন এবং যাতায়াতের ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তবে পর্যটকদেরও ন্যায্য দাম দিতে আপত্তি নেই।

এসব কথা বিবেচনা করে ব্যবসায়ীরা এসব কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন। তাতে তাঁদের ও তাঁদের মাধ্যমে ট্যাক্সি, রিক্সা, ছোটো-বড়ো দোকানদার, হোটেল ব্যবসায়ী, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি উৎপাদক—সবারই দু পয়সা আসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নানা ট্যাক্সের মাধ্যম সরকারও কিছু আয় করতে পারে। সেজন্য সরকার, হোটেল ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্টসহ পর্যটন সম্ভারের উন্নয়নকারী নতুন লাইনে নিয়োগকারী একদল নতুন শিল্পপতিদেরও এ কাজে হাতে লাগাতে হবে। তবেই দেশের ও বিদেশের প্রতিযোগিতাকে মোকাবিলা করে বাংলা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির পর্যটন সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

লেখক পরিচিতি মন্ত্রী, পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ছবি কাজল বিশ্বাস

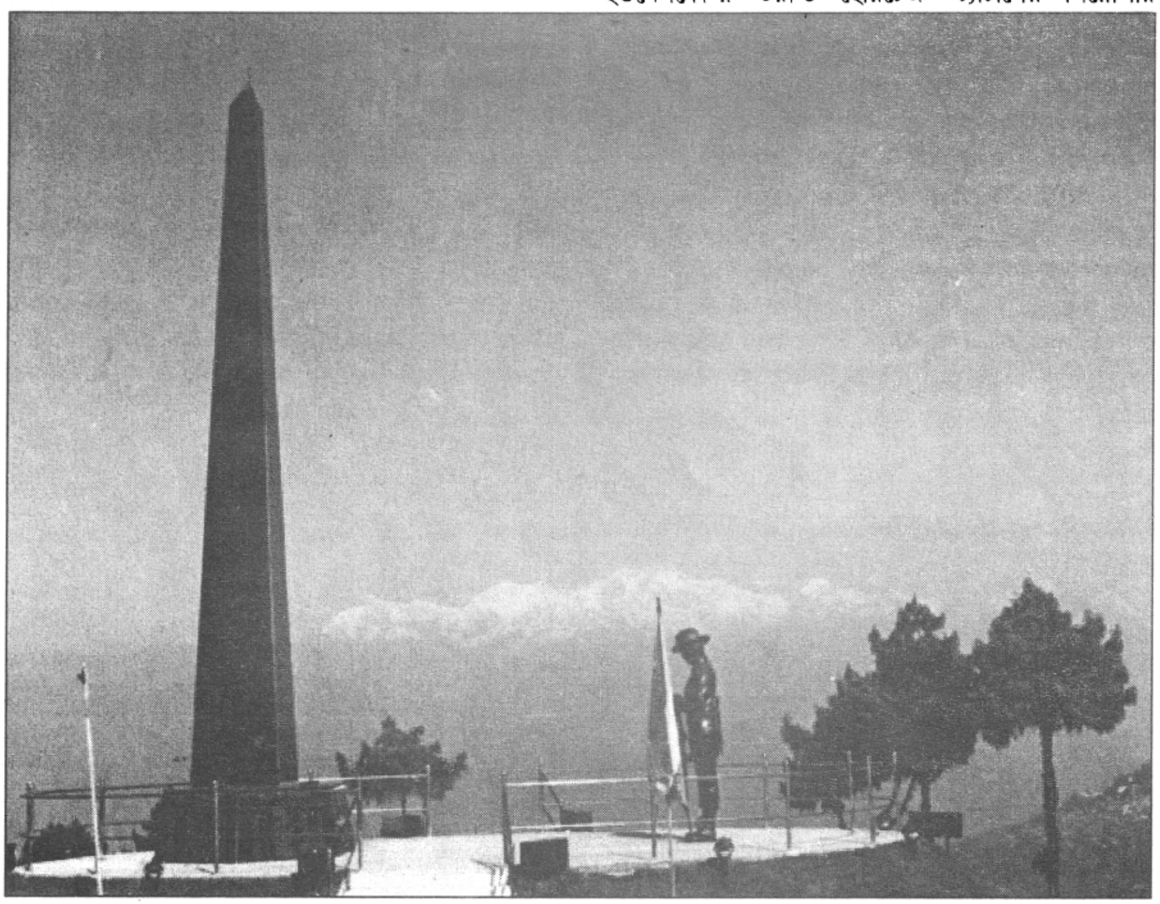
বাংলার মণিমুক্তো

সুকান্ত রায়

মানচিত্রে চোখ রাখলে আপনি দেখতে পাবেন, পূর্ব হিমালয়, উত্তর-পূর্ব ভারত আর দূর প্রাচ্যে যাওয়ার সিংদরজায় দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। কোথাও সূর্যস্নাত তুষারঢাকা পর্বতমালার কোল ঘেঁষে সবুজ চা-বাগান, ঘন অরণ্য ও বন্যপ্রাণী, কোথাও সাগরতীরের খাঁড়িতে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ! একদিকে ইতিহাসের গর্ভস্থানগুলিতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে আমাদের পূর্ব পরিচয়, অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিশান উড়ছে কলকাতায়। আর তার পাশাপাশি দিগন্তের নীলে মিশে আছে আমাদের গ্রামগুলি, যেখানে কাশফুলের বন পেরিয়ে অপু আর দুর্গা বিপুল বিস্ময়ে দেখে রেলগাড়ি, যেখানে পালা-পার্বণ, মেলা-উৎসবে মিলে যায় হারু কৈবর্ত আর রহিম শেখ। পর্যটকের জন্য মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে বাংলার সর্বত্র। তবু যার যেখানে মন টানে, সে সেখানে-ই যেতে চায়। তাই কম কথায় এ রাজ্যে পর্যটনের বৈচিত্র জেনে রাখা ভালো।

প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যটন

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে দার্জিলিং (২১২৩ মি) ছাড়াও রয়েছে কার্শিয়াং (১৪৭৫ মি), কালিম্পং (১২৪৩ মি)। নৈসর্গিক নিজস্বতায় অনন্য দার্জিলিং পর্যটকের কাছে এক অপার বিস্ময়। টাইগার হিল (২৫৭৩ মি) থেকে সূর্যোদয় দেখার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ইউনেসকো-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্ট্যাটাসের শিরোপায়





দীঘায় সমুদ্র স্নান পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ — *ছবি কাজল বিশ্বাস*

গর্বিত টয় ট্রেন, লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানায় রেডপান্ডা, তেনজিং নোরগের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, রোপওয়ে, ঘুম বৌদ্ধ মনাস্ট্রি, আর পর্যটকের অপেক্ষায় সাজিয়ে রাখা দোকানগুলিতে চীন ও তিব্বতের শিল্প-সংস্কৃতির নানা নিদর্শন ভালো লাগবে। দার্জিলিং থেকে যাওয়া যায় লেপচাজগৎ, লোপচু, মানসঙ, মংপুতে। কার্শিয়াং থেকেও কাঞ্চনজংঘার রেঞ্জ চমৎকার দেখা যায়। দার্জিলিং থেকে কালিম্পং আসার পথে দেখে নেওয়া যায় তিস্তা আর রঙ্গিতের মিলন, কালিম্পং-এর প্রতিটি জানলায় পূর্ব হিমালয়ের ঐশ্বর্য আর পথের ধারে নার্সারি, নানা জাতের ক্যাকটাস। দার্জিলিং থেকে মানেভঞ্জন হয়ে যাওয়া যায় সান্দাকফু (৩৬৩৬ মি) ফালুট (৩৫৮৩ মি) কিংবা রাম্মাম-রিমবিক্-এর পথে। কিছুদিন হল মিরিকে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নতুন করে পর্যটকদের টানছে লাভা (২১৪৮ মি), লোলেগাঁও (১৫১৬ মি), সামসিং, সুকনা, কালিঝোরা, লাটপাঞ্চার।

দার্জিলিং থেকে কালিম্পং আসার পথে দেখে নেওয়া যায় তিস্তা আর রঙ্গিতের মিলন, কালিম্পং-এর প্রতিটি জানলায় পূর্ব হিমালয়ের ঐশ্বর্য আর পথের ধারে নার্সারি, নানা জাতের ক্যাকটাস।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পুবের দুয়ার—ডুয়ার্স। প্রায় ৫২০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গভীর অরণ্য, দুর্বিনীত তোর্সা, তিস্তা, জলঢাকা নদীর বাঁকে বাঁকে চা-বাগান—সব নিয়েই ডুয়ার্সের প্রকৃতিতে ভিন্ন স্বাদের পরিবেশ পর্যটন। গরুমারা জাতীয় উদ্যান, মহানন্দা অভয়ারণ্য, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, বক্সা টাইগার রিজার্ভ—যাঁরা জঙ্গলে বেড়াতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য। জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে চেপে দেখা যায় হরিণ ও নানা ধরনের পশুপাখি। এরই কাছাকাছি রাজাভাতখাওয়া। ঝালং, বিন্দু, চালসা, মুর্তি, ভুটানঘাট, বক্সা দুয়ার আর জয়ন্তী। এছাড়া কোচবিহার যাওয়ার পথে চিলাপাতা, হাসিমারার জঙ্গলে দেখা হয়ে যেতে পারে ধূর্ত চিতাবাঘের সঙ্গে।

উত্তরে ডুয়ার্স, দক্ষিণে সুন্দরবন। সমুদ্র উপকূলে ৫৪টি ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে সুন্দরীগাছের অরণ্যের নামে এলাকার নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার শতকরা ৭০ ভাগ নোনাজলের নিচে। বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ্ অরণ্যে সুন্দরী, গেন্ধা, ধুঁধুল, গরান গাছের আড়ালে ওত পেতে আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে আছে বিশাল মোহনায় কুমির, পাইথন, কেউটে, খড়িয়াল। আবার সুন্দরবনেই দেখা যায় নানা জাতের মরশুমি পাখির। ১৯৯৭ সালে ইউনেসকো সুন্দরবনকে 'বায়োস্ফিয়ার এরিয়া' এবং 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বলে ঘোষণা করেছে।

ডুয়ার্স, সুন্দরবনের পাশাপাশি ছোটো বড়ো জঙ্গল, নদীতে সমৃদ্ধ পশ্চিমের বনাঞ্চলে ঘুরে দেখে নিতে পারেন পঞ্চকোট, অযোধ্যা পাহাড়, মুরুগুমা, শুশুনিয়া, মুকুটমণিপুর, সুতানের জঙ্গল, কাঁকড়াঝোড়, বাঁশপাহাড়ি, লালমাটি, ঝিলিমিলি, বেলপাহাড়ি ঝাড়গ্রাম, হাতিবাড়ি।

প্রকৃতি পর্যটনের আর এক বিস্ময়কর আকর্ষণ আছে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রসৈকতে—দীঘা, শংকরপুর, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, সাগরদ্বীপে। দীঘার কথা সবাই জানেন, দীঘার থেকে মাত্র ১০ কিমি, দূরে 'ক্যাসুরিনার ছায়া গায়ে মেখে' আপনার অপেক্ষায় আছে শংকরপুরের সাগরবেলা। যমজ বোন ফ্রেজারগঞ্জ আর বকখালি সবার থেকে আলাদা।

কলকাতা থেকে চার ঘণ্টার রাস্তায় এই সাদা বালির সৈকতে ঘুরে আসতে পারেন যেকোনো উইকএন্ডে। প্রবাদ যাই-ই থাকুক, গঙ্গাসাগারে একবার গেলে আপনাকে বারবার আসতেই হবে। দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশির এমনই অমোঘ টান। থাকা খাওয়ার জায়গার অভাব নেই। কম খরচে এমন বেড়াবার সুযোগ কজনের জোটে !

রোমাঞ্চকর পর্যটন

ট্রেকিং ! এই শব্দটির উপর যৌবনের টান অপরিসীম। হিমালয়ের রাস্তায় ট্রেকিং-এর কথা অনেক লেখা হয়েছে, আগ্রহী পাঠকমাত্রেই জানেন। মানেভঞ্জন থেকে সান্দাক্‌ফু-ফালুট বা রাম্মাম-রিমবিক্‌-এর ট্রেকিং রুট এখন তরুণ প্রকৃতিপ্রেমিকদের হাতের পাঁচ। উভয় রুটেই প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। শুধু ঠিকঠাক যোগাযোগ করে সময়মতো জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু দুঃসাহসী পর্যটক যদি পদে পদে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে চান তাহলে যাবেন ডুয়ার্সের সীমানা ঘেঁষে জয়ন্তী নদীর ধারে দুর্গম জঙ্গলের পথ ধরে মহাকালের গুহায়। এ পথে সাজানো গোছানো তাঁবু নেই, বাধা নেই, আছে শুধু দুর্গমের প্রতি দুরন্ত আকর্ষণ। আর একটা ট্রেকিং রুটের কথাও বলে রাখি—নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সান্তালবাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে গিয়ে সেখান থেকে সোজা ট্রেকিং করুন বক্সা পাহাড়। অন্যদিকে আছে সুন্দরবনের খাড়িতে ভট্‌ভটিতে চেপে হাতের তালুতে জীবন রেখে বাঘের খোঁজে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ (যদিও ভটভটিতে বন্দুক হাতে বনপ্রহরী থাকেন, তবু লম্বা ঘাসের আড়ালে 'বড়মিঞা' কখন পিছু নেবে কেউ জানে না)।

তিস্তার সাদা জলে রিভার র‍্যাফটিং, দার্জিলিংয়ের আশেপাশে পাহাড় বেয়ে ওঠা, শুশুনিয়ায় রক ক্লাইম্বিং, চন্দননগরে স্পোর্টস ক্লাইম্বিং, বিশেষ ধরনের নৌকা নিয়ে সুন্দরবনে বা অন্যত্র জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, সজনেখালি বা পূর্বস্থলিতে দেশবিদেশের পাখির খোঁজে ছুটে যাওয়া—সবই তো রোমাঞ্চকর ভ্রমণের আওতায় পড়ে। কিন্তু বাঙালি মায়েরা রবিঠাকুরের অনুরোধে সাড়া দেবেন—'শীর্ণ শান্ত সাধু—তব পুত্রদের ধরে / দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে'।

ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ

'ভিজিট টু এ প্লেস অব হিস্টিরিকাল ইন্টারেস্ট'—আমাদের ছাত্রজীবনে ইংরাজি পরীক্ষার আগের দিন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসাবে পি কে দে সরকারের বই থেকে এই রচনাটি আর একবার দেখে নিতে হত। যুগ বদলেছে, এখন আর এ ধরনের রচনা ছাত্রদের কাছে পরীক্ষার জন্য অন্তত ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু বাবামায়েরা ছেলেমেয়েদের দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ বা দক্ষিণ

অশোকনগর মিলেনিয়াম সায়েন্স পার্ক *ছবি প্রতীক সরকার*



কিন্তু দুঃসাহসী পর্যটক যদি পদে পদে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে চান তাহলে যাবেন ডুয়ার্সের সীমানা ঘেঁষে জয়ন্তী নদীর ধারে দুর্গম জঙ্গলের পথ ধরে মহাকালের গুহায়।



বহরমপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত নশিপুর রাজবাড়ী কিছুদিন আগেও ছিল পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু *ছবি কাজল বিশ্বাস*

ভারতে ইতিহাসের স্মারকগুলি দেখাতে নিয়ে যান, যাতে তাঁরা ভারতীয় হিসাবে নিজেদের উত্তরাধিকার উপলব্ধি করতে পারে। এসব খুবই প্রয়োজন, সভ্য সমাজে কূপমণ্ডুকতার স্থান নেই। কিন্তু বাংলা যার মাতৃভাষা, সে বাংলার ইতিহাস জানবে না ? শুধু পশ্চিমবঙ্গেই যেসব ইতিহাসের নিদর্শন রয়েছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা কি সেসব দেখেছে ? এই বাংলায় কত সৌধ, মন্দির, মসজিদ, গির্জাকে নিয়ে মুখে মুখে ফিরছে অসংখ্য লোককথা, আমাদের উত্তরসূরিরা তা জানে না। এই বিশ্বায়নের যুগে, এই আত্মবিস্মৃতির সময়ে আমাদের সন্তানসন্ততিদের দুধেভাতে রাখার কোনও উপায় নেই, তবু তারা জানুক তাদের পূর্ব পরিচয়, তাদের সুমহান ঐতিহ্য। চলুন ঘুরে আসি কোচবিহারের রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, সাগরদিঘি, রসিকবিল, ডুয়ার্সে গোসানিমারি, জলেশ্বর মন্দির, বক্সা ফোর্ট, মালদহে গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং আদিনায় ছড়িয়ে আছে মধ্যযুগে বাংলার রাজধানীর সব ঐতিহাসিক স্মারক—বড়োসোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল মসজিদ, লোটন মসজিদ, গুণতি গেট, ফিরোজ মিনার, আদিনা মসজিদ, একলাখি মুসোলিয়াম, আর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা মালদহের পুরাকীর্তি সংগ্রহশালা। বাংলার শেষ নবাবের লালবাগে রয়েছে নিমকহারাম দেউড়ি, খুশবাগ, হাজারদুয়ারি, ইমামবাড়া, মোতিঝিল, কাটরা মসজিদ, মদিনা মসজিদ, এবং ওয়াসিফ মঞ্জিল।



পুরুলিয়ার ছৌনাচ *ছবি : কাজল বিশ্বাস*

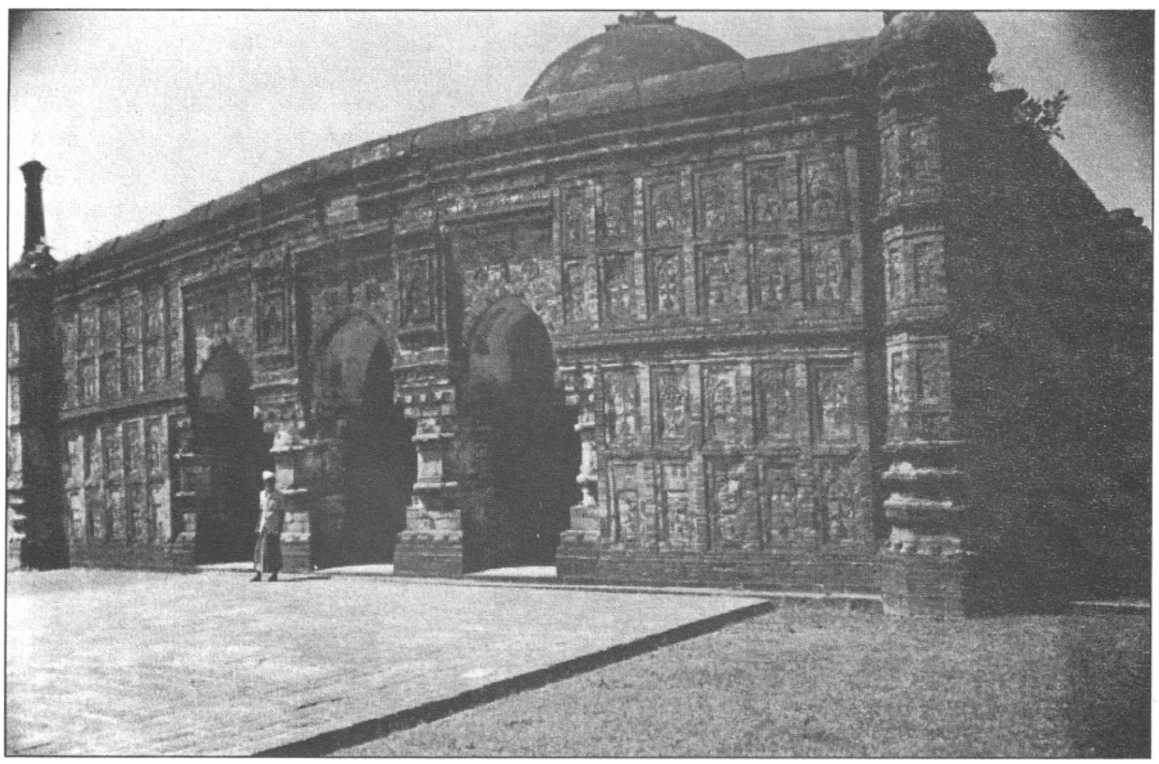
আর পলাশি সাক্ষ্য দেবে বিশ্বাসঘাতকেরা কীভাবে ক্লাইভের হাতে বাংলার মসনদ তুলে দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ ঘুরে চলে আসুন শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নদিয়ায়। সেই প্রথম সাম্যের গান গেয়ে পংক্তি ভোজনে আমজনতাকে বসিয়ে ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর ভক্তিস্রোতে ভেসে গিয়েছিল জাতপাতের বিভেদ। নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির, মায়াপুরে চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শনীয়। বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে অসংখ্য মন্দিরের গায়ে অনবদ্য টেরাকোটার কাজ নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে। আটপুর, কোতুলপুর মন্দির একই কারণে দর্শনীয়। ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি, চিলকিগড়ের রাজবাড়ি, কনক দুর্গার মন্দির, মহিষাদলের রাজবাড়ি সহ ইতিহাসের অনেক স্মারক রয়ে গেছে মেদিনীপুরে। ইংরাজ ছাড়াও এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের স্মৃতি থেকে গেছে হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে—ফরাসিদের চন্দননগরে, দিনেমারদের শ্রীরামপুরে, পর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেলে আর ডাচদের চুঁচুড়ায়। গঙ্গার পুবের পাড়ে হংসেশ্বরীর মন্দির, তারকেশ্বর মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর। বর্ধমানে এখন যাকে 'বিজয় তোরণ' বলে তার পূর্ব নাম—কার্জনগেট, বর্ধমান শহরেই পাবেন শের আফগানের সমাধি আর গোলাপবাগ। ১০৮টি শিবমন্দিরের জন্য বিখ্যাত কালনা। বীরভূমে বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, ললাটেশ্বর মন্দির আর কলকাতা হাইকোর্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, জি পি ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, জব চার্ণকের সমাধি, মার্বেল প্যালেস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, গঙ্গার এপারে দক্ষিণেশ্বর, ওপারে বেলুড়মঠ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে যেগুলি উল্লেখ করলাম প্রকৃতপক্ষে তা সামান্যের কিছু বেশিমাত্র, যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি জেলা পরিষদগুলি ইতিহাসের গর্ভস্থান ও ঐতিহ্যের বিস্তারিত তালিকা পাঠাতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা জেনে যাব যে বাংলা সম্পর্কে আমরা সত্যিই কত কম জানি।

সাংস্কৃতিক পর্যটন

বাঙালি মনের গোটা ক্যানভাস জুড়ে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতন সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির তীর্থস্থান। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিলনে গড়ে ওঠা গুরুদেবের বিশ্বভারতীর পাশাপাশি তাঁর দূরদর্শিতার প্রতীক কর্মসংস্কৃতির কেন্দ্র শ্রীনিকেতন। সাংস্কৃতিক পর্যটনের আর একটি কেন্দ্র হল বিষ্ণুপুর। টেরাকোটার শিল্পনৈপুণ্য ছাড়াও এই মন্দিরনগরী নিজস্ব ঘরানার ধ্রুপদি সংগীতের জন্য বিখ্যাত।

অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি-বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র-নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ কলকাতার যতটা ঐতিহ্যপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ততটাই স্বীকৃত সাংস্কৃতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে। নন্দন, বাংলা আকাদেমি, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, আকাদেমি অব ফাইন আর্টস, ভারতসভা হল, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন-মঞ্চ, চারুকলা ভবন, গণমাধ্যম কেন্দ্র। কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালা, রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি এশিয়াটিক সোসাইটি সহ বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রতিদিন কোনও না কোনও বিষয়ে চর্চা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বাংলার মন্দির গাত্রের টেরাকোটা শিল্প *ছবি সৌজন্যে পর্যটন বিভাগ*



বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে অসংখ্য মন্দিরের গায়ে অনবদ্য টেরাকোটার কাজ নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে।


গঙ্গাসাগর ছবি : কাজল বিশ্বাস

পাশাপাশি চলছে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনের লেখক ও পাঠকের সাহিত্যচর্চা আর কলকাতার বিখ্যাত 'আড্ডা'। মনস্বী গোপাল হালদার রসিকতা করে লিখেছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির দুই প্রিয় অনুষঙ্গ হল রসগোল্লা আর আড্ডা। বোধহয় সে কারণেই একবার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে বুদ্ধিজীবী আর হবু বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় না বসলে কলকাতায় সাংস্কৃতিক পর্যটন সম্পূর্ণ হয় না। এই শিক্ষিত সংস্কৃতির পাশাপাশি সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের রূপ বৈচিত্র। পশ্চিমবঙ্গে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে একটি লোকসংগীত-নৃত্যের দল বা কারুশিল্পী নেই। আবার আদিবাসী জীবনযাত্রার আবশ্যিক অনুষঙ্গ হল তাঁদের নাচ-গান। আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতিচর্চার সংগঠিত রূপ দেখতে পাবেন আমাদের বারোমাসে তেরো পার্বণের মেলা-উৎসবে। আসলে আমরা তো মিলতেই চাই। তাই আগ্রহী পর্যটক পশ্চিমবঙ্গে দেখে নিতে পারেন শারদোৎসব, শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা ও বসন্ত উৎসব, কেঁদুলির মেলা, রথের মেলা, বাণীপুর লোকসংস্কৃতি উৎসব, ঝাড়গ্রাম মেলা, সারস্বত উৎসব, তিস্তা-গঙ্গা উৎসব, রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব। এছাড়া কলকাতা ময়দানে সারা বছর ধরে কোনও না কোনও মেলা চলছেই। গত আট বছর ধরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১০—১৭ নভেম্বর) সারা পৃথিবীর নজর কেড়েছে। আর যে মেলার জন্য সমস্ত বাঙালি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন তা হল কলকাতা বইমেলা।

তীর্থস্থানে ভ্রমণ

আপন ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রীতি রক্ষায় গর্বিত পশ্চিমবঙ্গের তীর্থস্থানে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট—বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, নাখোদা মসজিদ, জাপানি বৌদ্ধমন্দির, মহাবোধি সোসাইটি, পরেশনাথ মন্দির, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা, হুগলি ইমামবাড়া, ফুরফুরা শরিফ, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বড়ো শিখ সংগত, মায়াপুরের ইসকনের মন্দির, সাগরে কপিলমুনির মন্দির, তারকেশ্বরে শিবমন্দির।

আপন ধর্মবিশ্বাস বজায় রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রীতি রক্ষায় গর্বিত পশ্চিমবঙ্গের তীর্থস্থানে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা রীতিমতো ঈর্ষণীয়।

শিল্প পর্যটন

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনগরীগুলি ক্রমশ পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকায় কাজের সুবাদে গিয়ে ২/১ দিন বেড়িয়ে আসা এখন অনেক বাঙালি রপ্ত করেছেন। শিল্পকেন্দ্রে পর্যটনের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় হতে পারে হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, ফলতা ও সল্টলেক।

কৃষি পর্যটন

ইউরোপে কৃষি পর্যটনের ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটন শিল্পকে সম্পন্ন করেছে, সেখানে শহর বা শহরতলির সাধারণ মানুষ সপরিবারে কাছাকাছি গ্রামে উইকএন্ড কাটাতে যান। এখানে ব্যবস্থা বলতে থাকে, গ্রামেরই কোনও কোনও বাড়িতে সংলগ্ন টয়লেট সহ একটি ঘরে রাত্রে থাকা-খাওয়ার আর সকালের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত যথেষ্ট সংগঠিত এবং ক্ষমতাশালী। এ রাজ্যে কৃষি পর্যটন জনপ্রিয় করার জন্য পঞ্চায়েতের একটু উদ্যোগ প্রয়োজন, এতে স্থানীয় ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা আছে।

[তথ্যসূত্র ডেস্টিনেশন ওয়েস্টবেঙ্গল]

পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে সারা পৃথিবীতে পর্যটন শিল্পেই সর্বাধিক কর্মসংস্থান হয়েছে। এ রাজ্যে যদি সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় এবং পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলি পরিকাঠামোগত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে নিম্নবিত্ত বাঙালির কম খরচে কাছাকাছি জেলায় বেড়ানোর সুযোগ এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান দুইই সম্ভব। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সম্ভবপর কাজটি করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা এবং সমন্বয়।

[তথ্যসূত্র : ডেস্টিনেশন ওয়েস্টবেঙ্গল]

আমি তোকে নোলোক কিনে দেবো
এবং দেবো চুলবাঁধা এক ফিতে
সতী মেলায় নাগর দোলায় চড়ে
ভুবন ঘুরে আপন করে নেবো।

—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার মেলার বিবর্তন

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মেলার উৎপত্তি হয়েছে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে প্রাচীনকাল থেকে। প্রাথমিক পর্বে মেলা ছিল পণ্য আদানপ্রদানের (barter) কেন্দ্র। তখন তা ছিল শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিনিময়ক্ষেত্র। এই পর্ব চলেছে দীর্ঘদিন—বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যতদিন না মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। মুদ্রার প্রচলনের পাশাপাশি মেলারও চরিত্র বদল ঘটে। তখন তা পরিণত হয় বিকিকিনির কেন্দ্ররূপে (market)। তবে মেলা গোড়া থেকেই মানুষের মেলামেশার স্থান (assembly) বলেই গণ্য হয়ে এসেছে। আবার আর এক অর্থে মেলা উৎসবও (carnival)। আমাদের বহু মেলা উৎসবকেন্দ্রিক। মেলার আর এক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনীর (exhibition) মধ্যেও বিদ্যমান। কৃষি-অর্থনীতি যেহেতু বাঁকুড়া জেলার মূল চরিত্র তাই এখানকার মেলাও কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ যখন কৃষিকাজে মানুষ ব্যস্ত থাকেন এবং যখন ফসল কেটে গোলাজাত করতে হয় সেসময় এবং বর্ষাকালে মেলার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, অন্যদিকে পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মেলার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। তার কারণ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রির





বেলিয়াতোড়ের গাজন মেলায় হিন্দোল বান

মাধ্যমে যে টাকা হাতে আসে তা ব্যয়িত হয় এইসব মেলায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মেলার সংখ্যা ৯৩ এবং পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মেলার সংখ্যা ৩১১।

বাঁকুড়া জেলার মেলাগুলিকে প্রধানত দুটি স্বতন্ত্র ধারায় ভাগ করা যায়—(১) ঈশ্বরকেন্দ্রিক (২) ঈশ্বর-নিরপেক্ষ। দু-প্রকার মেলাই ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সমান সহনীয়তা। দ্বিতীয় ধারার মেলাগুলির মধ্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য তো পাইই। প্রথম ধারার মেলাগুলিও তাই। যে সময়প্রিয়তা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য (basic features) তা সবরকম ঈশ্বরকেন্দ্রিক মেলাতেই লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় মৌলবাদ (communal) কোনো মেলার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না—তাহলে তা মেলার চরিত্র হারাবে। ধর্মীয় সহনশীলতাই (Religious tolarance) বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existence) সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার বা জাতীয় সংহতির (National Integration) কেন্দ্রীয় উপাদান। মেলা আমাদের বার-বার সে কথাই স্মরণ করে দেয়। বাঁকুড়ার মেলাগুলির চরিত্রও এই তানে বাঁধা।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক মেলাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শিবভিত্তিক মেলা। শিবকেন্দ্রিক দু-রকম উৎসব বাঁকুড়ায় প্রচলিত—(১) শিবরাত্রি (২) শিব-গাজন। শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনের কৃষ্ণা-চতুর্দশীতে। শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার পরেশনাথে সপ্তাহব্যাপী, চান্দাবিলা, পাঁচাল, পাত্রসায়ের, রোহিলাকোণ ও সারেঙ্গায় এক মাসব্যাপী মেলা বসে। শিব-গাজন অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র-বৈশাখে। বাঁকুড়ায় চৈত্র মাসে ৩০টি আর বৈশাখে ১২০টি শিব-গাজন অনুষ্ঠিত হয়। শিব-গাজনকে কেন্দ্র করে যে মেলাগুলি সংঘটিত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বোলাড়া, পাঁচাল, এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, মোলবনা, ডিহর, বিষ্ণুপুর, জগন্নাথপুর, পীড়রাবনীর গাজন। মেলা বসে মন্দিরসংলগ্ন জমিতে। এইসব গাজনমেলার তাৎপর্য হল শৈব অনুষ্ঠান হলেও সর্বধর্ম সময় ঘটে। নানা স্থান থেকে নানা মানুষ আসায় আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মিলন সাধিত হয়।

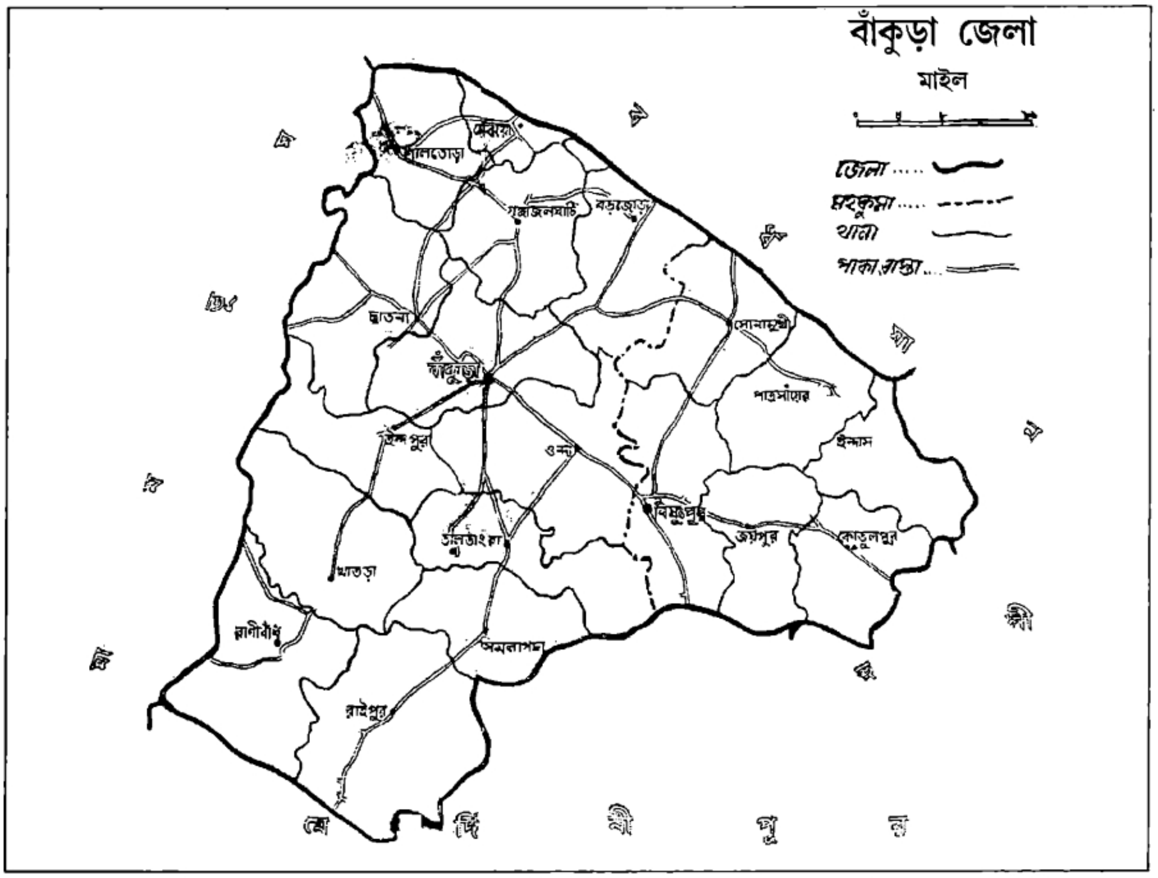
ধর্মরাজের গাজনমেলা অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়ার ময়নাপুর, বেলেতোড়, মটগোদা, কাপিষ্ঠা, মসিনাপুর, বৃন্দাবনপুর, বৈতল, দিগপাড়ে। এসব স্থানে ভক্তদের আগুনসন্ন্যাস ঝাঁপ, দণ্ডীকাটা, ধুনাপোড়ানো, বলিদান, বাণগ্রহণ ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধনা লক্ষ করা যায়। মটগোদার মেলার বিশিষ্টতা হল এখানে আদিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। আদিবাসী ও অন্যান্যদের সম্মিলিত অবস্থানে এই মেলা বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে। ময়নাপুরের হাকন্দ বারুণীমেলা ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই গাজনের আকর্ষণ ভক্ত্যা সন্ন্যাসীবৃন্দ।

ছাতনার গ্রামদেবী বাসলীকে কেন্দ্র করে 'চণ্ডীদাসের মেলা' বসে। ফাল্গুনের সপ্তমী থেকে দশমী

বাঁকুড়ার গ্রামীণ মেলায় স্থানীয় আদিবাসীদের কেনাকেটা



ধর্মরাজের গাজনমেলা অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়ার ময়নাপুর, বেলেতোড়, মটগোদা, কাপিষ্ঠা, মসিনাপুর, বৃন্দাবনপুর, বৈতল, দিগপাড়ে।



পর্যন্ত চারদিন এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমীর দিন সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে বসে বাউল গানের আসর। ১৯৪৫ খ্রি থেকে বাসলী মেলা চালু হয়। একে বলা হয় 'বাসলীর গাজন'।

মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলার বহু জায়গায় ঝাঁপান উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়। এই স্থানগুলি হল রাইপুর, ফুলকুসমা, মটগোদা, জামবনি, মেলেড়া, পেঁচাকোলা, দুধ্যা-নেদরা, শালবনি, খড়িগড়্যা, রসপাল, শুশুনিয়া, ধানাড়া, খাতড়া, ঝাঁপানডিহি, চাঁপাশোল, গোপালপুর, দহলা, সিমলাপাল, চাঁদপুর, পার্শ্বলা, মৌকুড়া, পুখুরিয়া, দুবরাজপুর, হাড়মাসড়া, পাঁচমুড়া, সাবড়াকোণ, বিবড়দা, কামারডিহা, সোনাঝোড়, ফুলমতী, রানীবাঁধ, বাউতড়া, ভবকুড়া, রাজাকাটা, বিষ্ণুপুর, বাঁকাদহ, জয়কৃষ্ণপুর, দেশড়া, কোতুলপুর, রানডিহা, বালিঠা, কোয়ালপাড়া, ইঁদপুর, পায়রাচালি, সাতামী, রামসাগর, চাঁদবিলা, জামডহরা, বড়লালপুর, কেঞ্জাকুড়া, রামপুর, মনোহরতলা, দোলতলা, মানকানালী, লাউদা, ছাতনা, সোনামুখী, পাত্রসায়ের। ঝাঁপানের প্রধান আকর্ষণ সাপখেলা। ঝাঁপানের মধ্যে সেরা বিষ্ণুপুরের 'বাঘ ঝাঁপান'।

দেবী সর্বমঙ্গলাকে কেন্দ্র করে নাড়িচায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বমঙ্গলা মেলা। পৌষসংক্রান্তিতে দেবীপূজা ও মাঘ মাসের প্রথম থেকে দিন দশেক এই মেলা বসে। মন্দিরসংলগ্ন আটচালায় নামসংকীর্তন হয়ে থাকে পাঁচ দিন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষকদের সমাগম ঘটে এই মেলায় সর্বাধিক। কৃষিজ ফলমূল থেকে পিতল, কাঁসা, বেতের, বাঁশের, মাটির, পাথরের, পোড়ামাটির কাজ বিক্রি হয়।

বাঁকুড়ার কিছু মেলা পরবকেন্দ্রিক। যেমন ভাদোই ধানে নবান্ন উৎসব ভাদু অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র মাসে। ভাদু উপলক্ষে মেলা হয় বড়জোড়ায়। মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে কুমারী নদীর তীরে পোরকুলে। এছাড়া, কোতুলপুরের সাপুর, বালিঠা, ওনপুকুর, রানীবাঁধের বুধখিল্যা, ইন্দাসের সনপুর, পাত্রসায়েরের মহেশপুরে, সিমলাপালের নেকরাতাপলে, বড়জোড়ার গৌরবেড়ায়, ওন্দার গোড়াসোল ও নাকাইজুড়িতে মেলা বসে।

বৈষ্ণব ধর্মকেন্দ্রিক মেলাগুলির মধ্যে বীরসিংহের মহোৎসব ও মেলা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এটি 'অভিরাম গোস্বামী ও বসুধা-জাহ্নবা-মানিকদাস বাবাজীর মহোৎসব'। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মেলায় বহু মানুষের ভিড় হয়। সপ্তাহব্যাপী নামকীর্তন ও গ্রামব্যাপী রাতভর বাউল গানে উৎসবটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া, রামদাস বাবাজির সমাধিবেদিতে বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণব ভোজন ও তিন রাত্রি ধরে

বাঁকুড়ার কিছু মেলা পরবকেন্দ্রিক। যেমন ভাদোই ধানে নবান্ন উৎসব ভাদু অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র মাসে। ভাদু উপলক্ষে মেলা হয় বড়জোড়ায়।

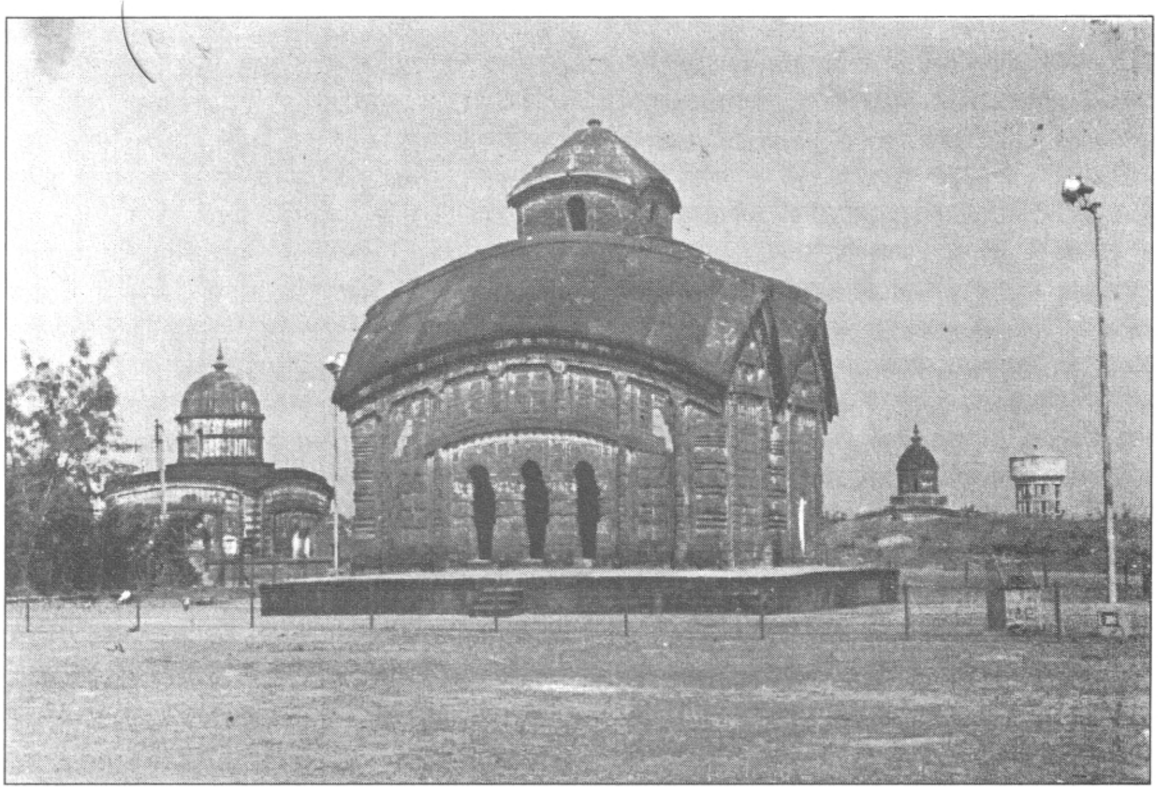
বাউলমেলার আয়োজন হয়। বীরসিংহগ্রামে লক্ষণ খাঁর উত্তরসূরি পতিতপাবন খাঁ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলার আয়োজন করেন। সোনামুখীতে মনোহর দাস ছিলেন তাঁতিদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগুরু। তাঁকে কেন্দ্র করে বাউল মেলা বসে সোনামুখীতে। এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন আউল-বাউল-সাঁইফকির, সাধুসন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও গৃহস্থরা। বাঁকুড়ার বীরসিংহপুরে পীরসাহেবের দরগা মাজারে 'উরস মেলা'য় বহু মানুষের সমাবেশ ঘটে। বিষ্ণুপুরের কুরবানতলায় কুরবান সাহেবের মাজারে প্রতি বছর মেলা বসে। গঙ্গাজলঘাঁটি থানার পীর পুষ্করিণী ফকিরবেড়াতে লসকর সাহেবের দরগায় মসজিদে মহরম, ইদুজ্জোহা উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হয়। এক্তেশ্বরে ২৯ চৈত্র সারা রাত্রিব্যাপী বাউল মেলা হয়। বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'উড়েশ্বরী মেলা' বসে। বিষ্ণুপুরের সীতারামপুরে চৈত্র মমাসের রামনবমীতে একদিনের 'তুড়কী মেলা' প্রবর্তিত হয়েছে। আগে সারা রাত বাউল গান শোনা যেত—এখন যায় না। 'বাহেগুরু ওম্' মন্ত্রের উদ্গাতা শিখ সন্ন্যাসী দ্বারা প্রবর্তিত এই মেলায় সম্প্রদায়নির্বিশেষে জনসমাগম ঘটে। বর্তমান সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবন দাস উদাসীন এক প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন, এই মেলার শুরু মৌনীবাবার আবির্ভাব থেকে। এর বয়স আনুমানিক ১৬২ বছর। বাঁকুড়ায় রথের মেলা ও বিষ্ণুপুরের উল্টোরথের মেলা সুখ্যাত। বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ ও কৃষ্ণগঞ্জের মেলা যথেষ্ট জনসমাগমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আট-দশদিন চলে বিষ্ণুপুরের মেলা। রামায়ণ, কীর্তন পালা ছাড়া নাচ-গান ও নানা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সারারাত্রি ধরে মানুষজন উপভোগ করেন এই মেলা। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে এই উৎসব হয়ে আসছে। বাঁকুড়ার দোলতলায় 'পঞ্চরাত্রির মেলায়' পাঁচদিন ধরে চলে অন্নপূর্ণার পূজা। ঘোষের গাঁও রাজগাঁয়েও পঞ্চরাত্রির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরের 'রাসমেলা'ও একটি উল্লেখযোগ্য মেলা।

এইসব ধর্মীয় মেলার দু-একটি বাদে সব চরিত্রই এক। কোথাও-না-কোথাও দেখা যাবে বিক্রি হতে বাঁশের কাজ, মাটির তৈরি নানারকম শিল্পসামগ্রী, মনোহারি জিনিসপত্র, শঙ্খের কাজ, কাঠের খেলনা, প্লাস্টিকের খেলনা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা,

বীরসিংহগ্রামে লক্ষণ খাঁর উত্তরসূরি পতিতপাবন খাঁ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবীয় উৎসব ও মেলার আয়োজন করেন।

বাঁকুড়ার তুসু পরবের টেরাকোটার নৌকা প্রদীপ *ছবি পাপান ঘোষ*





বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির *ছবি সৌজন্যে পর্যটন বিভাগ*

ফেরিওয়ালা, সারিবন্ধ দোকান, সার্কাস, যাত্রা, নাচনি নাচ, থিয়েটার শিবায়ন গান, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, চাষবাসের জিনিস, আচার, কুটিরশিল্পের যন্ত্রপাতি, তেলেভাজা, পানের দোকান, তীর ছোঁড়া, মুরগি লড়াই, অলংকার, বেলুন, মুখোস, ফুচকা, রাজভোগ, ঘুঘুনি ইত্যাদি। ধর্মীয় মেলা হলেও ধর্মের কঠোরতা কোথাও চোখে পড়ে না। মানুষের এক মহামিলন সাধিত হয় এইসব মেলায়। যেন মূর্ত জাতীয় সংহতি।

তবে একথাও ঠিক, এইসব মেলা ক্রম-অবক্ষয় ও অবলুপ্তির পথে। কয়েকটি সারিবন্ধ দোকান এমেলা-সেমেলা ঘুরে বেড়ানোয় মেলাগুলি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। তাছাড়া, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বদলাচ্ছে। ফলে কারিগররাও সময়ের ভাষা পড়ে নিজেদের বৃত্তিবদল ঘটাচ্ছেন। তাঁদের তৈরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনেক সময় ধনীদের বৈঠকখানা সাজানোর উপকরণে পরিণত হয়েছে। ফলে এগুলি তাদের অনন্যতা হারাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন নতুন প্রজন্মের কাছে এদের আকর্ষণ ক্ষমতা কমছে।

বাঁকুড়া জেলার ক্রমবিবর্তনে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিজ্ঞানের শিক্ষা যত বেশি মানুষকে প্রভাবিত করছে মানুষ তত বেশি অলৌকিক ও অতিলৌকিকের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিশিক্ষা ও যুক্তিবাদ মানুষকে অন্য দীক্ষায় দীক্ষিত করছে। মানুষ পুরাণকে পরিণত করছে নবপুরাণে। তাছাড়া, মুক্ত অর্থনীতির বিকাশ মানুষকে নির্দেশ করছে ভিন্নরকম মেলায় অভ্যস্ত হতে। প্রগতিমনস্ক মানসিকতাও অন্য মেলার অনুসন্ধানে রত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হলো বইমেলা, বস্ত্রমেলা, যুবমেলা, পুষ্প প্রদর্শনী মেলা, শিশুমেলা, লিটল ম্যাগাজিন মেলা।

বাঁকুড়া জেলার এই বিবর্তন ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি বিষ্ণুপুর মেলা। এই মেলা ১৯৮৮ থেকে বীরহাম্বির নগরে প্রতি বছর নিয়মিত হয়ে আসছে। বাঁকুড়ার শিল্পসংস্কৃতিকে জনপ্রিয় ও আধুনিক অভিরুচিযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা আছে এই মেলায়। এর ফলে জেলার আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই মেলা। বাঁকুড়ার ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পকে 'বৃহত্তর ভারতীয় পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিবেশী সহোদরাদের সঙ্গে হৃদয়ে সেতুবন্ধন করা'ও এই মেলার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও বহুবিধ সম্মানপ্রাপ্ত কারুশিল্পীরা তাঁদের কাজ নিয়ে আসেন এই মেলায়। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভা অন্বেষণ ও সংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নয়নের কাজ চলে এই মেলার মাধ্যমে। লোকশিল্পীরা আসেন তাঁদের গান নিয়ে। নাটক, সংগীত, আলেখ্য, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, ছৌ-নাচের সঙ্গে শহরের শিল্পীদের গান-বাজনা-নাটক-আবৃত্তি মিলেমিশে এক

বাঁকুড়া জেলার ক্রমবিবর্তনে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিজ্ঞানের শিক্ষা যত বেশি মানুষকে প্রভাবিত করছে মানুষ তত বেশি অলৌকিক ও অতিলৌকিকের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে।

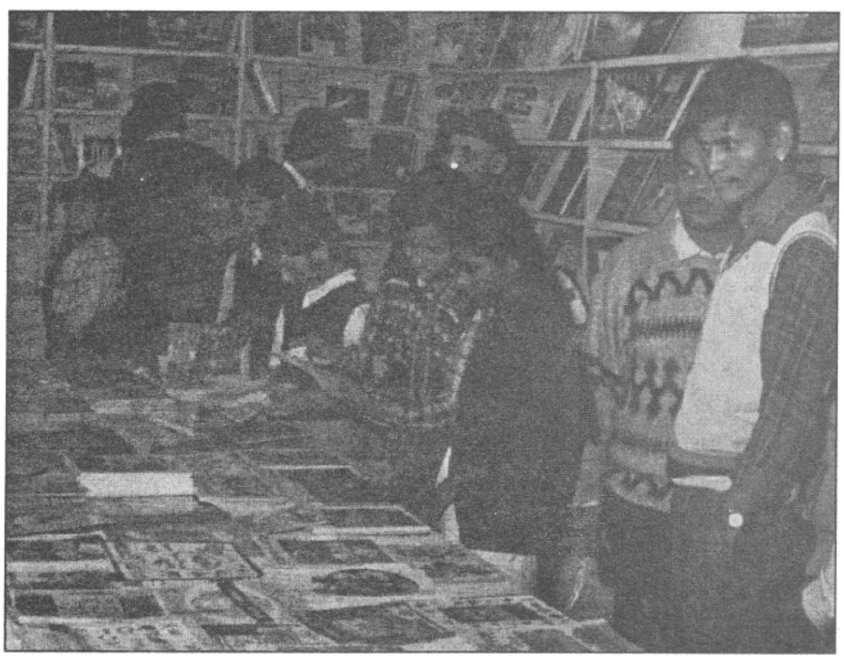
ঈশ্বরনিরপেক্ষ মেলাগুলির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলে সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। বিকৃতরুচির সংস্কৃতি ভয়াবহভাবে গ্রাস করছে শহর ও মফস্বলগুলোকে—এর সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই রকম মেলার বৈচিত্র ও আয়োজন বিশেষ প্রয়োজন।

অনবদ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসে নবীন শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠী ও সংস্থা। চিত্র প্রদর্শনী এই মেলার আঙ্গিককে শতগুণে সুসমৃদ্ধ করে। শহর ও শহরতলির এক যোগ্য সমীকরণ ঘটে এই মেলায়। তাছাড়া, পুষ্প প্রদর্শনী ও কৃষি প্রদর্শনী এবং ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সব মিলে এ-মেলাকে করে তুলবে 'শিল্প, সুর ও জীবনের মেলা'। অধ্যাপক পবিত্র সরকার যথাযথই মন্তব্য করেছেন, 'এই মেলা রাঢ়বঙ্গের শুধু নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির মিলনের একটি উপলক্ষ্য হয়ে উঠেছে এবং হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির অন্তরকেন্দ্রে পৌছবার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে এই মেলা শুধু কেনাবেচা নয়, মানুষের মিলনের এবং সাংস্কৃতিক-শিক্ষার এক পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বাঁকুড়ার বইমেলা সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এখানে স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থের সঙ্গে শহরের নানা প্রকাশনীর বইও বিক্রি হয়। ফলে অনেক কাম্যগ্রন্থ সহজলভ্য হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে মঞ্চে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা ও পুরস্কার প্রদান।

বাঁকুড়া জেলা জনস্বাস্থ্যচেতনা প্রসার সময় কমিটির উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য জাঠা ও জেলা জনস্বাস্থ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যমেলা, প্রদর্শনী, সেমিনার ইত্যাদি এর অঙ্গ। বলা হয়েছে, জনস্বাস্থ্যের মূল ধারণাটি আলমা আটা (১৯৭৮) ঘোষণা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মূল কথা স্বাস্থ্য মানে কেবল রোগমুক্তি নয়—শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভাল থাকা। স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিটি গ্রামে জনগণের উদ্‌যোগে জল, পুষ্টিবৃদ্ধি, অপুষ্টি দূরীকরণ, শৌচাগার নির্মাণ, মা ও শিশুর যত্ন, টীকাকরণ, যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়াসহ সংক্রামক ব্যধির প্রতিরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি নিতে হবে। তাছাড়া, প্রজনন সমস্যা, শিশুস্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, এইড্‌স ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে এইসব মেলাকে কেন্দ্র করে। ভেষজ চিকিৎসকরাও অংশ নিয়েছেন এই ধরনের মেলায়।

বাঁকুড়ার বই মেলা



এছাড়া, বস্ত্রমেলা, আনন্দমেলা ভিন্নরকম রুচির পরিচয় দেয়। আনন্দমেলা শিশুদের প্রমোদমূলক দ্রব্য বিক্রির মধ্য দিয়ে শিশুদের মনোরঞ্জক হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দু-বছর ধরে বাঁকুড়া তথা ভারতের অনন্য ব্যক্তিত্ব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে রামানন্দ ময়দানে (পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া) ১৮-২২ ডিসেম্বর 'রামানন্দ মেলা'র আয়োজন হয়েছে। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ইত্যাদি। এর উদ্যোক্তা বাঁকুড়া জেলা প্রেস ক্লাব।

ঈশ্বরনিরপেক্ষ মেলাগুলির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। বিকৃতরুচির সংস্কৃতি ভয়াবহভাবে গ্রাস করছে শহর ও মফস্বলগুলোকে—এর সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই রকম মেলার বৈচিত্র ও আয়োজন বিশেষ প্রয়োজন। আগামিকাল অপেক্ষা করছে নতুন সংস্কারমুক্ত সুস্থপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ ভালোবাসাময় মেলাগুলির দিকে। তবে একই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে এইসব মেলা যেন জনবিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে।

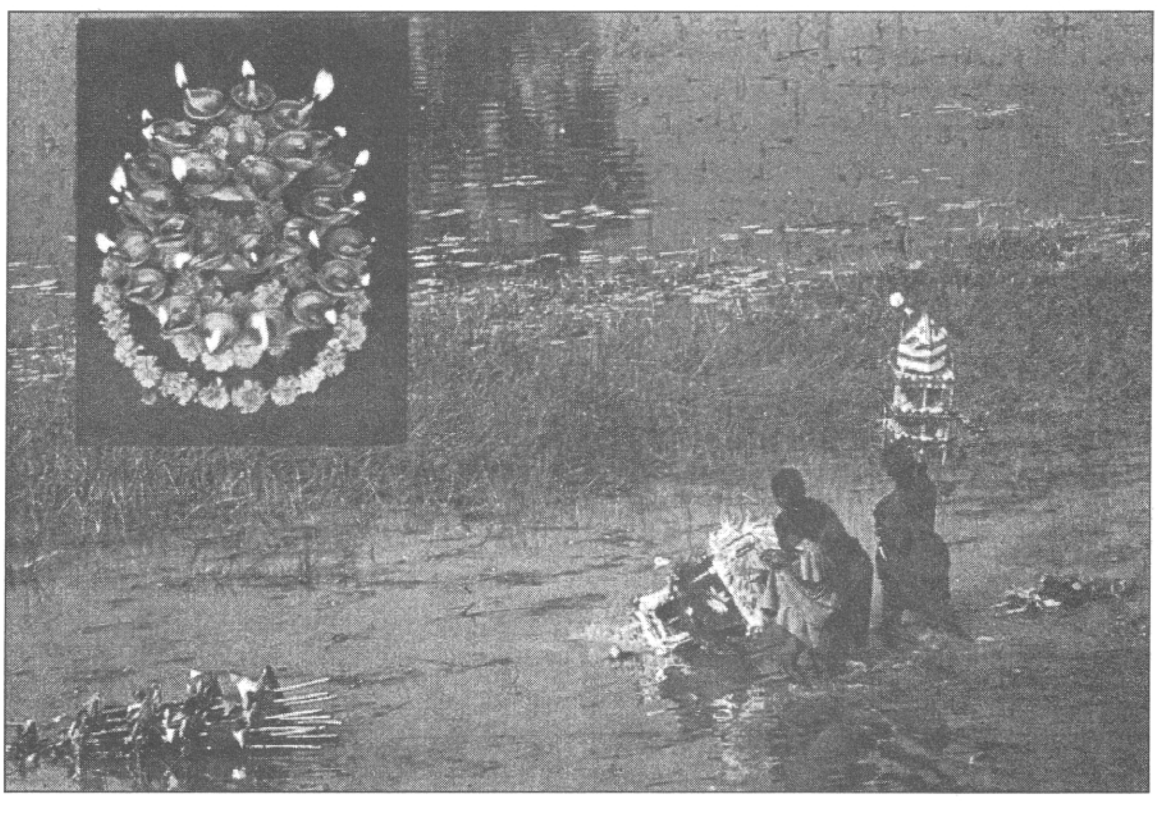
আজকাল শহরেও কিচেন ফার্নিচার ফেয়ার বা এই জাতীয় মেলা হচ্ছে। গ্রামীণ মেলার সঙ্গে এই ধরনের মেলার পার্থক্য বিস্তর। এগুলি যেহেতু গড়ে-তোলা মেলা এবং পূর্বপরিকল্পিত তাই এগুলির মধ্যে যতটা নান্দনিকতার প্রকাশ হচ্ছে ততটা স্বতঃস্ফূর্ততা চোখে পড়ে না। গ্রামীণ মেলাতেও নানাকিছু বিক্রি হয় কিন্তু তা কখনই একমাত্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু বাণিজ্যকেন্দ্রিক মেলাগুলিতে বাণিজ্য মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করায় আর সব গৌণ হয়ে যায়। এসব মেলায় আত্মপ্রচার ও আত্মজাহির করার মানসিকতা প্রধান হয়ে ওঠায় মেলাগুলি সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবল প্রতাপ এরকম মেলায় চোখে পড়ে। ফলে মেলার যে মূল চরিত্র—মহামিলন তা হারিয়ে যাচ্ছে। ভিন্ন রকম মেলার সংগঠকদের এই সীমাবদ্ধতাও মাথায় রাখতে হবে।

মল্লভূমের লোকায়ত সংস্কৃতি

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য

ইতিহাস খ্যাত জঙ্গাল মহলের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে সেটেলমেন্ট অফিসার বাবু রামপদ চ্যাটার্জি লিখেছেন যে এর প্রস্থ মাত্র ৮ মাইল (প্রায় ১২ কিমি) এবং দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল (প্রায় ৯০ কিমি)। এর পূর্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পাঞ্চেৎ এবং দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ। এই অঞ্চলেই আছে 'ভূম' নামধারী কয়েকটি এলাকা। মানভূম, শিখরভূম, বরাহভূম, সিংভূম, ধলভূম, মল্লভূম প্রভৃতি রাজ্য ভৌগোলিক অখণ্ড ভূ-ভাগের অন্তর্গত। সমগ্র অঞ্চলটি কঙ্করময় অনুর্বর মালভূমি। এর উত্তরাংশেই বর্তমানে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অবস্থান। বাঁকুড়া ভূম রাজ্যের অন্যতম মল্লভূম। ভবিষ্যপুরাণে এই অঞ্চল অজলা, ঊষর কঙ্করময় ভূমি, যার তিনভাগ জঙ্গাল, একভাগমাত্র গ্রাম এবং সামান্য কিছু চাষযোগ্য উর্বর জমি। একাদশ শতাব্দীতে লিখিত ভবদেব ভট্টের লিপিতে এই ভূভাগকে বলা হয়েছে ঊষর ও জঙ্গালময় এবং য়ুয়ান চোয়াঙ্ ও একে 'কজঙ্গাল' বলে অভিহিত করেছেন।

এ বিষয়ে উক্ত রামপদবাবুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'The soil is charaterised as very rocky country, mountaineous and overspread with thick-forests.......The description might be true when Hunter wrote but the explorations of the Bengal Nagpur Railway (Now S.E.Rly) has reduced the thickness of the forests, made the track



much more accessible to the outer world than it was 30 years ago, and revealed extensive areas of very fertile lands bordered on by barren laterite tracts.' (বাবু রামপদ চ্যাটার্জির সার্ভে রিপোর্ট ১৯০৩-১১, পৃষ্ঠা-১৬)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রেলপথ নির্মাণের সময় থেকে এই অনুর্বর রুক্ষ লালমাটির দেশের অরণ্যের ঘুম ভাঙতে থাকে আর ক্রমানুসারী পথ বেয়ে আসে অরণ্যাঞ্চলের আদিম আরণ্যক জনগোষ্ঠীর গতানুগতিক জীবনাচর্যায় পরিবর্তনের হাওয়া, সেই হাওয়ায় হয়তো ছিল সভ্যতার সুগন্ধ মেশানো। এই পরিবর্তনের ইতিহাস অনেকটাই অস্পষ্ট, ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষায় আছে।

উৎস মল্লভূমের লোকায়ত সংস্কৃতির উৎস অনুসরণের প্রয়াসে এই পটভূমির কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বলাবাহুল্য বাঁকুড়া সীমা নির্দিষ্ট জেলায় গঠিত হবার আগে জঙ্গাল মহলের চৌহদ্দির মধ্যেই এর অধিকাংশ ভূখণ্ড, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থান, কাজেই স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নই নেই। জঙ্গাল মহলের মিশ্র লোক-সংস্কৃতির আওতায় মল্লভূমের সংস্কৃতি লালিত ও পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এ কথা সত্য যে জঙ্গাল মহলের শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্যাঞ্চল বহু দিন বহিরাগত আর্যদের কাছে অনাবিষ্কৃতই থেকে গিয়েছিল। অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগণই এখানকার ভূমিপুত্র। এঁরা হলেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, কোল, হো, খেড়িয়া, লোধা, শবর ইত্যাদি, নৃতত্ত্বের ভাষায় যাঁদের আদি অস্ট্রালয়েড বা কোলিড জনগোষ্ঠী বলা হয়। এরাই সমগ্র জঙ্গাল মহলের আদি অধিবাসী। আর্য-অনার্য সঙ্ক্রমণে এক সংকর জাতি হিসাবে বাঙালি নামধারী জনগোষ্ঠীর উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই এই আদিম মানুষেরা এদেশে বসবাস করছেন। দীর্ঘদিনের মেলামেশায় সংস্কৃতির নব রূপায়ণের ফলে আদি জনগোষ্ঠীর পুরাতন সংস্কৃতির রূপরেখা বাঙালি সমাজে সহজে দেখা যায় না। তবুও জঙ্গাল মহলের শম্বুকগতি সময় ও সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়া চলমান সংস্কৃতির মধ্যে এখনও রয়ে গেছে বাংলার কোনো কোনও অঞ্চলে, রবীন্দ্রনাথের মতে ফুল-পল্লবের চাকচিক্যে আকর্ষণীয় মহীরুহের নিচে শিকড়ের অলক্ষ্য অস্তিত্বের মতো। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলের এবং পুরুলিয়া জেলার জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ সেই আদিম জাতি গোষ্ঠীর বংশধর হিসাবে সেই সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহক।

লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম আধার হল লোকবিশ্বাস, লোককথা ও লোকাচার। এদের মধ্যে লোকবিশ্বাসের সর্বপ্রধান ভিত্তি হল ধর্ম-বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারনা।

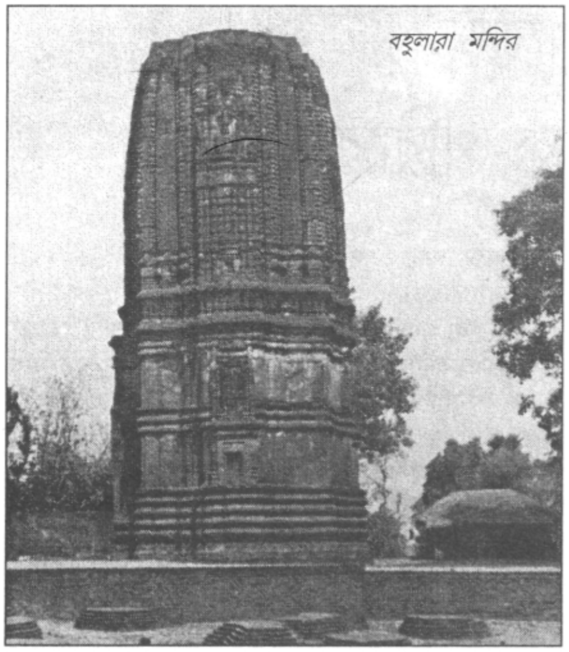
স্বরূপ ঃ লোকায়ত সংস্কৃতির অন্যতম আধার হল লোকবিশ্বাস, লোককথা ও লোকাচার। এদের মধ্যে



বাঁকুড়ার ঘোড়া নাচ

লোকবিশ্বাসের সর্বপ্রধান ভিত্তি হল ধর্ম-বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা। মল্লভূম অঞ্চলে আছে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব। এর বহু পাথুরে প্রমাণ ও লিখিত দলিল আছে। সে বিবরণ বেশ বিস্তৃত ও গভীর। জঙ্গাল মহলের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, কোথাও বা গ্রাম্য দেবদেবীর থানে ওই সব মূর্তি পূজিত হচ্ছে আজও। ওন্দাগ্রামের পাশে বহুলাড়ার মন্দিরে জৈন মূর্তি ও অলংকরণের কথা সহজেই মনে পড়বে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। সে আলোচনা এখন থাক।

ভিলম গ্রিম ও এলম গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় যখন বহু লোককথা সংগ্রহ করে Kinder Und Hausmarchen-গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন বিষয়টি যথেষ্ট বিতর্কিত হয়ে ওঠে। লোককথা সম্বন্ধে নানা মতবাদের উদ্ভব হয়। এঁদের Theory of Solar Myths মতবাদীরা পুরাণ কাহিনিকেই লোককথার উৎস বলে মনে করেন। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের পরবর্তীকালে ম্যাকস্মুলার, এঞ্জেলো দ্যা গুবারনেটিস, জন ফিকস্ ও স্যার জর্জফকস্ প্রমুখ এই মতবাদকেই সমর্থন করেন। জার্মান অধ্যাপক থিয়োডোর বেন ফে এদেশের লোক কাহিনি গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' অনুবাদ করেন ১৮৫৯ সালে,



তাঁর মতে ভারতেই সবচেয়ে বেশি লোককথার উদ্ভব হয়েছে। প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অ্যানড্রু ল্যাং বলেন, প্রাচীন সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির ধারাবিবরণীই রয়েছে লোককথার মধ্যে। তাঁর মতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সমাজ সংস্কৃতির চেতনা থেকেই স্বাধীনভাবে লোককথার সৃষ্টি হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন লোককথাগুলি হল স্বপ্নে দেখা ঘটনার বিবরণ বা কুসংস্কারের অভিব্যক্তি মাত্র। বলা বাহুল্য এই সব মতবাদের কোনোটিই সর্বাংশে সত্য নয়। এমনকী রূপকাশ্রয়ের ব্যাখ্যাও সব সময় সাযুজ্য রক্ষা করে না।

লোকায়ত সংস্কৃতির তৃতীয় এবং বোধকরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল লোকাচার। বিদেশি পণ্ডিতদের মতে লোকাচারের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ এবং তৎসংক্রান্ত আচার আচরণের মধ্যেই নিহিত থাকে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপরেখা। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। লক্ষণীয় মল্লভূমের লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখিত সব কয়টি তত্ত্বকথার দৃষ্টান্ত আছে। কেবল ব্যাখ্যার অপেক্ষা।

প্রত্যয়ন

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদান রয়েছে প্রচুর। তাদের অন্যতম প্রধান হল লোক ধর্মাচারসংক্রান্ত কিছু লোকসাহিত্য এবং লোকগীতি। আর ধর্মাচার সম্পর্কিত ছাড়াও আছে কিছু লোক-গান কাহিনি কিংবদন্তি প্রভৃতি। এদের মধ্যে বহু আলোচিত কয়েকটি হল

১। **ভাদু** ঃ দেবতা রূপকে মানবীয় জীবন বন্দনা, পূজা ও সম্পর্কিত লোকগান প্রধানত মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্ষাকালীন উৎসব। এটি ক্রমেই অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির মহিলাদের মধ্যেও প্রচলিত হচ্ছে। বহু আলোচিত বিষয়।

২। **তুষু ও ইতু** শস্য বন্দনার রূপকে উত্তর বর্ষাকালীন উৎসব। মূল আচার পূজার্চনা তৎসহ লোকগান। এটিও প্রধানত মহিলাদের আচরণীয়। সমবেত সংগীত যেন পূজারই উপকরণ। অনেকে এদের সঙ্গে বর্ণ হিন্দুর বেদ-পুরাণোক্ত দেবদেবীর প্রতিরূপ কল্পনা করেন। সেটা সংস্কৃতির সংকরায়ণের প্রভাব হতে পারে।

৩। **করম** ঃ বৃক্ষ পূজার রূপকে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপাসনা। করম গাছের দুই ডাল মাটিতে পুঁতে পূজানুষ্ঠান চলে। এটিও বর্ষাকালীন উৎসব। মেয়েদের নাচ-গান এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ, বিশেষ করে কিশোরী কন্যা ও নববিবাহিতা গৃহবধূদের বিশেষ ভূমিকা আছে। এর প্রচলন সম্বন্ধে কয়েকটি উপাখ্যানও শোনা যায়। মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব।

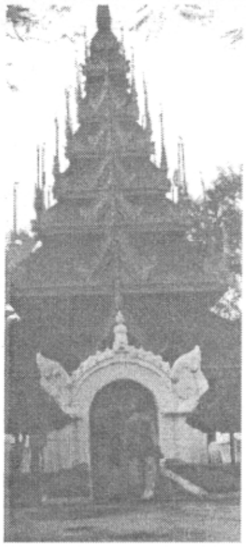
৪। **বাঁধনা** ঃ গো বন্দনার রূপকে মূলত পশু পরিচর্যা। এর সঙ্গে আসামের রঙ্গোলি বিহু উৎসবের মিল আছে। বাঁধনা শ্যামাপূজাকালীন উৎসব (Pre-harvest)। মূলত আদিবাসীদের উৎসব হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই উৎসব পালন করে।

এছাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসবের প্রিয় ঋতু হল শীতকাল (Post-harvest period)। পৌষ মাসের প্রায় সবদিনই এবং মাঘ মাসেও বিভিন্ন স্থানে ছোটো বড়ো নানারকম মেলা বসে। এদের অনেকেরই তারিখ ও স্থিতিকাল নির্দিষ্ট থাকে। স্থানীয় ভাষায় এদের 'যাত' বলা হয়। এটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

লোকায়ত সংস্কৃতির একটা বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেটা হল এর নৃত্য ও সংগীতময়তা। শ্রমজীবী মানুষের কঠোর জীবনচর্যায় অবসর বিনোদনে সংগীতের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শ্রমের আর্তনাদ থেকেই নাকি সংগীতের সৃষ্টি, আর নৃত্যের মুদ্রা ও লাস্য তো শ্রমের অঙ্গসঞ্চালনের প্রতীকী অনুকৃতি মাত্র। এই কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের মনোযোগী মননের সাহায্যে।

মল্লভূমের লোকসংস্কৃতি চিরকাল গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে লোকসংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে। এদের অনেকেই এখন লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। যেমন, এক প্রকার আঞ্চলিক সংগীত প্রচলিত ছিল যার নাম 'টাঁড় সংগীত'। এই টাঁড় সংগীত রাখাল-রাখালিদের মুখে মুখে ফিরত। শোনা যায় এই গানে আদিরসের বাহুল্য থাকত। তাই বোধ হয় বর্তমান রুচিবোধে ওই সব গান অবহেলিত এবং শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে।

বিদেশি পণ্ডিতদের মতে লোকাচারের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ এবং তৎসংক্রান্ত আচার আচরণের মধ্যেই নিহিত থাকে লোকায়ত সংস্কৃতির রূপরেখা।



ইডেন গার্ডেন্স
একটি আদর্শ নান্দনিক পরিবেশ উদ্যান

দৃষ্টিনন্দন মনোহর নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সের ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। ইতিহাসের পাতা উল্টে চলে যেতে হবে ১৮৩৬ সালে। তখন ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড অক্‌ল্যান্ডের রাজত্বকাল। ইডেন গার্ডেন্সের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করেন উক্ত ভাইসরয় অক্‌ল্যান্ডের দুই বোন এমিলি ইডেন ও ফ্যানি ইডেন। সেই সময়ের ইডেন গার্ডেন্স ছিল আকারে বর্তমান উদ্যানটির তিনগুণ এবং সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ছয় বছর। ইডেন গার্ডেন্সের পোশাকি নাম 'লেডি বাগিচা'।

ক্রমে ক্রমে ইডেন গার্ডেন্সে থাবা বসিয়েছে আকাশবাণী ভবন, ইডেন উদ্যান (ক্রিকেট মাঠ), নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও সব শেষে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র। অবশিষ্টাংশে আজকের এই ইডেন গার্ডেন্স। ইডেন গার্ডেন্সে ঢোকার দুটি পথ আছে। একটি গোষ্ঠ পাল সরণির উপর, অপরটি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পাশে ক্ষুদিরাম সরণিতে। গোষ্ঠ পাল সরণির দিককার গেট দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে এর নান্দনিক দৃশ্য—চওড়া পিচের রাস্তা, রাস্তার দুধারে স্বল্প উচ্চতার সারিবদ্ধ গাছ (Hedge), কিছুটা এগিয়ে মূল রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ রয়্যাল পাম বা বটল পামগুলি উদ্যানটিকে শুধু সমৃদ্ধ করেনি—করে তুলেছে মনোমুগ্ধকর। বিশাল চওড়া রাস্তাটিতে দেখা যাবে দুটি রোম্যান্টিক ফোয়ারা।

একটু পরেই চোখ টেনে নেয় বিশাল সবুজ গালিচা। ইচ্ছে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গালিচায় মনপ্রাণ ঢেলে দিতে। সবুজ গালিচার এক প্রান্তে সুদৃশ্য ১২৮ বর্গমিটার জুড়ে থাকা ব্যান্ডস্ট্যান্ডটি অতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আজও ওই ব্যান্ডস্ট্যান্ডে ব্যান্ড বাজার রেওয়াজ সমানে চলছে প্রতি রবিবারে।

বর্তমান ইডেন গার্ডেন্সে ৮৩ প্রজাতির মোট ৭৬৮টি বড় গাছ, কমবেশি ৫০ ধরনের গুল্ম ও ১১ প্রজাতির লতা গাছ আছে যার ফলে উদ্যানটি উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের পক্ষে উপযুক্ত।

বাগানটির শোভা বাড়িয়েছে ৪টি বিভিন্ন প্রজাতির মোট ১২২০ মিটার স্বল্প উচ্চতার সারিবদ্ধ গাছ, ৫৫২ বর্গমিটারের জবা বাগান, প্রায় ৯৫ বর্গমিটার জুড়ে গুল্মের বাগান, ১১৩ বর্গমিটারের কলাবতী গাছের ক্ষেত্র, ৪০ বর্গমিটার এলাকায় মরশুমি ফুলের জায়গা।

ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য রয়েছে মোট ১০টি খেলাধুলার সরঞ্জাম, তার মধ্যে অধুনা সংযোজিত ব্যালান্স ব্রিজ, রোলার স্লিপ ও ওয়াকিং ব্যারেল অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বাগানের এক কোণ ঘেঁষে চোখে পড়বে একটি কাচ ঘেরা ঘর, যাতে রাখা আছে নানা প্রজাতির ক্যাকটাস ও সাকুল্যান্ট গাছ। এছাড়া আছে ২টি রকারি ও একটি জাপানিস গার্ডেন।

ইডেন গার্ডেন্সের তিন প্রান্তে তিনটি 'নার্শারি' আছে। যেখানে প্রতিনিয়ত তৈরি করা হচ্ছে নতুন গাছ, এর মধ্যে আছে বহুমূল্যবান পাম, ফার্ন, ইন্ডোর হাউস প্ল্যান্ট, বাহারি গাছ, মরশুমি ফুলের গাছ যা সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়। কলকাতায় প্রতি বছর জুলাই মাসে অরণ্য সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে বেশি মাত্রার গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হাজার হাজার নতুন চারাগাছের যোগান দেয় এই নার্শারি।

ইডেন গার্ডেন্সের আরও একটি আকর্ষণীয় দিক এঁকেবেঁকে চলা জলাশয়টি। এই জলাশয়ে প্রতিদিন খেলে জোয়ার ভাটা। কখনও জল যায় কমে, কখনও তা যায় বেড়ে। প্রতি বছর জলাশয়টিতে ছাড়া হয় মাছ এবং অগাস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই জলাশয়ে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হয় দৈনিক ১৫০ টাকার টিকিটের মূল্যে। এছাড়াও জলাশয়টিতে আছে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা জনপ্রতি ৫ টাকার বিনিময়ে। এই জলাশয়ে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে একটি মিসটিক ভাস ফোয়ারা।

ইডেন গার্ডেন্সের মূল আকর্ষণ অবশ্য বহুবর্ণশোভিত, অসাধারণ কারুকার্যময় একটি বর্মীয় প্যাগোডা। স্থাপত্য শিল্পের এক অসাধারণ নিদর্শন সম্পূর্ণ প্যাগোডাটি বার্মা-সেগুন কাঠের তৈরি। এই প্যাগোডাটি উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন বর্মা দেশের প্রোম রাজ্যের রাজ্যপালের স্ত্রী মা-কিন ১৮৫৪ সালে এবং তা এই বাগানে স্থাপন করা হয় ১৮৫৬ সালে। বেশ কয়েকবার প্যাগোডাটির সংস্কার করতে হয়েছে এবং সর্বশেষ ২০০০ সালে প্যাগোডাটির সংস্কার করা হয়েছে। এই প্যাগোডাটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপাসনাস্থল। আজও তাই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকী নেপাল থেকেও হাজির হন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূজা ও উপাসনার জন্য। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ মানচিত্রে এই ইডেন গার্ডেন্স ও প্যাগোডাটির উল্লেখ রয়েছে। পর্যটকদের কাছে আজও তাই ইডেন গার্ডেন্সের আকর্ষণ লক্ষণীয় বিষয়। এই উদ্যানটি আজকাল প্রায়শই ব্যবহার করা হচ্ছে শুটিং জোন হিসাবে। শুটিং করার প্রতিদিনের খরচ মাত্র ১০০০ টাকা। ইট-কাঠ-পাথর-সিমেন্টের জঙ্গল কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক উদ্যানটি কলকাতাবাসীর কাছে একটি ফুসফুস। অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীক।

১৫ একর আয়তনবিশিষ্ট ইডেন উদ্যানের পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্বে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের নগর ও বিনোদন বনায়ন বিভাগ।

এই প্যাগোডাটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের উপাসনাস্থল। আজও তাই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকী নেপাল থেকেও হাজির হন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূজা ও উপাসনার জন্য।

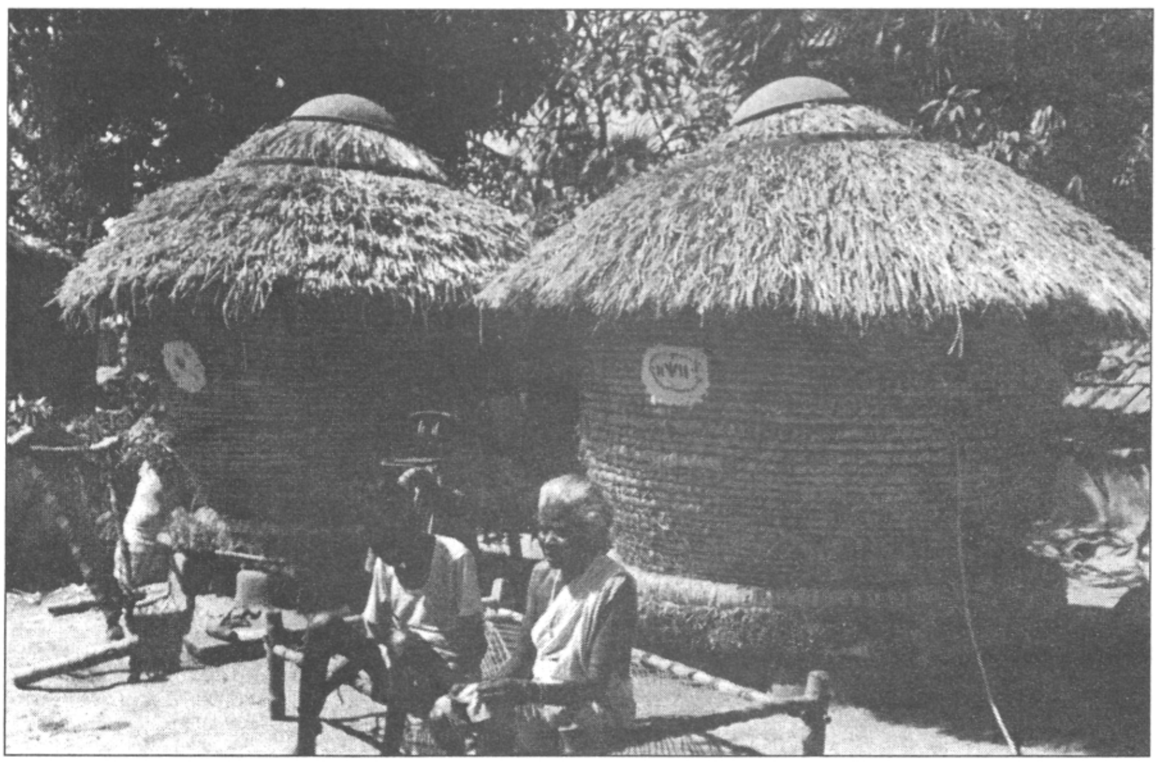
বীরভূমের পথে পথে

সৌর বসু

কলকাতা থেকে ট্রেনে বীরভূম আসার পথে বর্ধমান ছাড়ালেই রেলের কামরাতেই শোনা যায় 'দেশ-বিদেশের মানুষ গো যাও এ বীরভূম ঘুরে'। মাথায় ঝুঁটিবাঁধা এক কিশোর বাউল নাচের তালে তালে গানটি গেয়ে চলেছে। গানটির মধ্য দিয়ে বীরভূমের দর্শনীয় স্থানের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ যেন বীরভূমের চলমান বিজ্ঞাপন। আউল-বাউলের দেশ বীরভূম। শীতের মুখে মুখেই বীরভূমে মেলা-উৎসবের ঢল নামে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অস্তিত্ব এখনও বীরভূমে এলে টের পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলার উত্তরে ৪৫৪৫ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে বীরভূমের অবস্থান। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিহার, পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান এবং দক্ষিণে অজয় নদ বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার বিভাজন রেখা।

বীরভূমের বুক চিরে চলে গেছে রেলপথ দক্ষিণ থেকে উত্তরে। ১০৫ কিলোমিটার রেলপথে বীরভূম অতিক্রম করতে লাগে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। মূল এই রেলপথ থেকে শাখা রেলপথ গেছে মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান জেলায়। আহম্মদপুর-কাটোয়া ন্যারোগেজ লাইনটি ম্যাকলয়েড কোম্পানি স্থাপন করে ১৯১৭ সালে। এই রেলপথের উপরই অবস্থিত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের বাসভূমি লাভপুর। এই পথেও রেলভ্রমণে পাওয়া যায় অনাবিল আনন্দ। সবুজ ধানখেতের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে আজও ছুটে চলে সাবেক আমলের কলের গাড়ি। কলকাতা থেকে জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে রেলপথে বীরভূমে প্রবেশ করলে প্রথম স্টেশন বোলপুর।





কোপাই নদী

বোলপুরকে কেন্দ্র করে বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করা যেতে পারে। বোলপুর থেকে ১৮ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত ইলামবাজার। বোলপুর থেকে বাসে অথবা গাড়িতে চৌপাহাড়ির জঙ্গল পার হয়ে ইলামবাজারে প্রবেশের পথ। চৌপাহাড়িতে শালবনের ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আদিবাসীদের গ্রাম। সাঁওতাল আদিবাসীরাই আজ এই জঙ্গলের রক্ষাকর্তা। জঙ্গল ছাড়িয়ে একটু এগোলেই ইলামবাজার। ছোট জায়গা। এখানে বাজারের ভিতরে একটি মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির কাজ দর্শনীয়। এছাড়া ইলামবাজার থেকে সিউড়ির রাস্তায় বামুনপাড়ায় একটি লক্ষ্মী-জনার্দনের সুন্দর মন্দির আছে। ইলামবাজার থেকে সিউড়ির রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে বাঁহাতি রাস্তা চলে গেছে ধানখেতের মধ্যে দিয়ে। এই পথে আরও ১১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে কেন্দুবিল্ব। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেবের জন্মস্থান। এখানেই মকর সংক্রান্তির ভোরে অজয়ে স্নান দিয়ে শুরু হয় জয়দেব মেলা। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ বাউল গান। সারারাতব্যাপী গান-বাজনায় বিভোর থাকে এই মেলা। সরকারিভাবে তিনদিন হলেও এক সপ্তাহেরও বেশিদিন ধরে চলে এই মেলা। কেন্দুবিল্ব গ্রামের অপর এক দ্রষ্টব্য রাধাবিনোদের মন্দির। এই মন্দিরের গায়ের টেরাকোটা কাজের অনেকটাই আজ নিশ্চিহ্ন। তা হলেও মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন। মন্দিরটি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুর ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে বীরভূম গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে।

পোড়ামাটির কাজের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় জয়দেবের কাছে ইলামবাজারের ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ঘুরিষা গ্রামে। ঘুরিষা বীরভূমের অন্যতম বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামের মন্দিরগুলির মধ্যে রঘুনাথজির মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এটি তৈরি হয় ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরটি চারচালা। এর গায়ে যে পোড়ামাটির কাজ আছে তা মূলত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর।

অন্য মন্দিরগুলির মধ্যে নবরত্ন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ঘুরিষা থেকে সিউড়ি যেতে মূল সড়কের পাশে অবস্থিত হেতমপুর। এখানে হেতমপুরের রাজার বাসগৃহটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। রাজবাড়ির সংগ্রহে আছে দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র এবং দামি আসবাবপত্র। হেতমপুর ছাড়িয়েই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের মাঝেই রাস্তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে সিউড়ি, দুবরাজপুর এবং নিরাময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে। দুবরাজপুর এক সময় হেতমপুরের জমিদারির অংশ ছিল। এখানে বেশ কয়েকটি শিব মন্দির আছে। এর মধ্যে অক্ষয় দাসীর মন্দিরের গায়ে খোদাইয়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। দুবরাজপুরের মাটি খুব রুক্ষ। মূল সড়কের ধারেই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথর। এখানেই দুটি বড় পাথর অদ্ভুতভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরাই স্থানীয়দের কাছে মামা-ভাগ্নে পাহাড় নামে খ্যাত।

দুবরাজপুর থেকে সিউড়ি যাওয়ার পথে পড়বে সদ্যনির্মিত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সিউড়ি থেকে এর দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। কৃষিনির্ভর জেলা বীরভূমের শিল্প সম্ভাবনার প্রাণকেন্দ্র এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। বীরভূমের সদর শহর

দুবরাজপুর থেকে সিউড়ি যাওয়ার পথে পড়বে সদ্যনির্মিত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সিউড়ি থেকে এর দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার। কৃষিনির্ভর জেলা বীরভূমের শিল্প সম্ভাবনার প্রাণকেন্দ্র এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি।

সিউড়ির ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী। রেলপথের সঙ্গেও সিউড়ি শহর যুক্ত। শহরের কেন্দ্রে বসেছে জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তর জেলা পরিষদ কার্যালয়, কাছারি প্রভৃতি। সিউড়ি শহরের পুরাতন সার্কিট হাউসটি বোধ করি জেলার সর্বাপেক্ষা পুরাতন সরকারি বাড়ি। এটি নির্মিত হয় ১৮০৬ সনে। বর্তমানে বাড়িটি সংস্কার করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কার্যালয় হয়েছে। এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত জিনিসের একটি সংগ্রহশালা আছে।

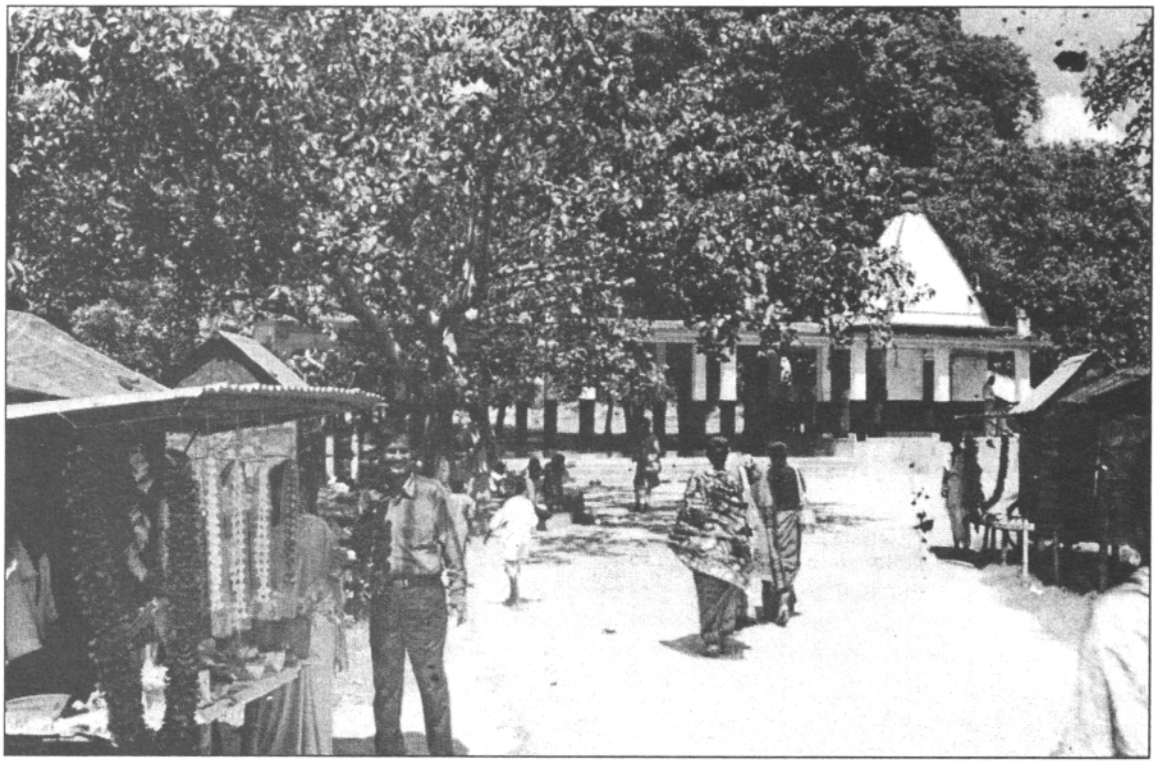
সিউড়ির দক্ষিণে ময়ূরাক্ষী নদীর বুকে নির্মিত তিলপাড়া বাঁধটির পরিবেশ মনোরম। শীতে পরিযায়ী পাখিদের আগমনে এটি ক্রমশ জনপ্রিয় একটি পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।

সিউড়ি থেকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত রাজনগর অতীতে বীরভূমের রাজধানী ছিল। অতীতের এই রাজধানী ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য বহন করছে। স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান প্রজারা এখান থেকে তাঁদের শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। এখনও রাজনগরে ইমামবাড়া, নহবতখানার ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। সিউড়ি শহরের ১২ কিমি পশ্চিমে পাথরচাপুড়ি গ্রাম। এখানে মুসলিম পীর শাহ মেহবুবের সমাধিস্থল। শাহ মেহবুব স্থানীয়দের কাছে দাতাসাহেব নামে পরিচিত। এই পীরসাহেবের স্মৃতির উদ্দেশে এখানে চৈত্র মাসে এক মেলা বসে। এক সপ্তাহব্যাপী এই মেলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই মেলা। বক্রেশ্বর সিউড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

সিউড়ি থেকে ঘন ঘন বাস যাচ্ছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতবাদীদের সমন্বয় ঘটেছে বক্রেশ্বরে। একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান বক্রেশ্বর। এখানে আছে বক্রনাথ শিবমন্দির এবং মহিষমর্দিনী মন্দির। বক্রেশ্বরের অপর খ্যাতি তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য। উষ্ণ প্রস্রবণের অনেকগুলি কুণ্ড আছে এখানে। ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশীতে এখানে মেলা বসে। বক্রেশ্বরে থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন আবাস তৈরি করেছে। এছাড়া বেসরকারি লজও আছে এখানে।

সিউড়ি থেকে মল্লারপুর যেতে জাতীয় সড়কের পাশে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত গণপুরের জঙ্গল। এখানে আছে বনবিভাগের বাংলো। নিবিড় বনানীর মধ্যে একটা-দুটো রাত কাটানোর আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে এখানে।

সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন সাঁইথিয়া। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত সাঁইথিয়া একটি পীঠস্থান। রেল স্টেশনের বিপরীতে এই পীঠস্থানকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে নন্দীকেশ্বরী মন্দির। সাঁইথিয়া থেকে রেলপথে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে রামপুরহাট স্টেশন। রামপুরহাট থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে অপর এক পীঠস্থান তারাপীঠ। দ্বারকানদের তীরে তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র এই তারাপীঠ। সাধক বামাখ্যাপা এখানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তারাপীঠে এখন



কঙ্কালিতলার মন্দির

সিউড়ি থেকে ঘন ঘন বাস যাচ্ছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতবাদীদের সমন্বয় ঘটেছে বক্রেশ্বরে। একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান বক্রেশ্বর। এখানে আছে বক্রনাথ শিবমন্দির এবং মহিষমর্দিনী মন্দির। বক্রেশ্বরের অপর খ্যাতি তার উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য।

প্রত্যেকদিনই প্রচুর জনসমাগম ঘটে। এখানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে অনেক হোটেল। যেখানে ইচ্ছে করলে রাত্রিবাস করা যেতে পারে। রামপুরহাটের উত্তরে রেলপথের উপর অবস্থিত নলহাটি। নলহাটি একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ। এখানে টিলার উপর অবস্থিত ললাটেশ্বরী মন্দির। নলহাটি স্বাস্থ্যকর জায়গা। একসময় কলকাতা থেকে অনেক ব্রাহ্ম পরিবার এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। নলহাটির থেকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমারের রাজবাড়ি। এই বাড়িটির ধ্বংসবাবশেষ আজও বর্তমান। ভদ্রপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে আকালীপুরে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত কালীমন্দিরটি তন্ত্র সাধনার অপর এক কেন্দ্র।

সাঁইথিয়া থেকে ছোট লাইনের ট্রেনে লাভপুর আসা যায়। এছাড়া বোলপুর এবং সাঁইথিয়া থেকে বাসপথেও লাভপুরের যোগাযোগ আছে। লাভপুর বীরভূমের অপর একটি পীঠস্থান। এখানে পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ফুল্লরার মন্দির। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার দিন সেখানে মেলা বসে। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের বাড়িও এই লাভপুরে। তাঁর লেখার মধ্যে তাই ফিরে ফিরে আসে লাভপুর সন্নিহিত অঞ্চলের কথা, হাঁসুলীবাঁকের কথা। তারাশঙ্করের বসতবাড়িতে বর্তমানে গড়ে উঠেছে একটি সংগ্রহশালা। লাভপুরে বেড়াতে এলে সংগ্রহশালাটিও একবার ঘুরে দেখা যেতে পারে। ১৪শ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর। নানুরে আছে বিশালাক্ষী মন্দির। চণ্ডীদাসের পূর্বপুরুষেরা বিশালাক্ষীদেবীর উপাসক ছিলেন। এই মন্দিরটির কাছে একটি বিশাল ঢিবি আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ঢিবি খনন করে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ উদ্ধার করে। চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গী রামী ধোপানির স্মৃতিবিজড়িত পুকুরটিও এখানে অবস্থিত। দোল পূর্ণিমার দিন প্রতি বছর নানুরে মেলা বসে। বোলপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে কোপাইনদীর তীরে অপর একটি পীঠস্থান কঙ্কালিতলা। এখানে মনোরম পরিবেশে শিবের একটি মন্দির আছে। কঙ্কালিতলায় প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে।



বোলপুর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ছোট গ্রাম ইতণ্ডা। বোলপুর-পালিতপুর রাস্তায় মুলুক পেরিয়ে একটু এগিয়েই ডানহাতি রাস্তা চলে গেছে পাঁচশোয়া হয়ে ইতণ্ডার দিকে। এই ইতণ্ডাতেই একটি জোড়বাংলা মন্দির আছে। মন্দিরটির গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য করা সমসাময়িক জীবনের ও ব্রিটিশ যুগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়—বন্দুক হাতে ইংরেজ সেনার পাশে পাগড়ি পরিহিত ভারতীয় সেনা। আবার শিকারের দৃশ্য, মহিষাসুরমর্দিনী, বিষ্ণু অবতার, তারই পাশাপাশি সারেঙ্গিবাদক।

এই ইতণ্ডাতেই একটি জোড় বাংলা মন্দির আছে। মন্দিরটির গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য করা সমসাময়িক জীবনের ও ব্রিটিশ যুগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়—বন্দুক হাতে ইংরেজ সেনার পাশে পাগড়ি পরিহিত ভারতীয় সেনা।

বীরভূমের মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ দেখতে গেলে এই জীর্ণপ্রায় মন্দিরটি অবশ্যদর্শনীয়। তবে যাতায়াতের কষ্ট আছে। বাস চলাচল অনিয়মিত। গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যেতে পারে। বোলপুরের কাছেই সুরুল গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরে ব্রিটিশ আমলের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন চিপ একটি কুঠি নির্মাণ করেন। এই কুঠিটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। চিপ সাহেবই বীরভূম জেলায় প্রথম নীল চাষ প্রবর্তন করেন। সুরুলে অনেকগুলি দেউল আছে। সেগুলির পোড়ামাটির কাজ বেশ আকর্ষণীয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পঞ্চরত্ন মন্দিরটি। এই মন্দিরে লক্ষ্মী-জনার্দনের বিগ্রহ আছে। বোলপুরের চার কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত সুপুর গ্রামে একটি নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আছে। দুজন ফরাসি সাহেব এখানে কুঠি স্থাপন করে। সুপুরের দুটি শিবমন্দিরের কারুকার্য বেশ আকর্ষণীয়। একটি মন্দির অষ্টকোণাকৃতি, অপরটি সাধারণ দেউল। মন্দিরে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও সাহেবি পোশাক পরিহিত মূর্তিও দেখা যায়।

বীরভূমের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতন অন্যতম। ১৮৬৩ সনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের সিংহ পরিবারের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি কিনে শান্তিনিকেতন পত্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল নিভৃতে ভগবৎ সাধনা। রবীন্দ্রনাথ এই শান্তিনিকেতনেই ১৯০১ সনে স্থাপন করেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে সেখানে শুরু হয় পঠনপাঠনের কাজ। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে স্থাপিত হয় বিশ্বভারতী, যা আজকের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শান্তিনিকেতনে দুদিন সময় হাতে নিয়ে এলে সমগ্র এলাকাটি ঘুরে দেখা সম্ভব। যাঁরা অল্প সময় হাতে নিয়ে আসবেন, তাঁরা যাবেন উত্তরায়ণে। এখানেই বিচিত্রাভবনে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদির সংগ্রহশালা। এ ছাড়া উত্তরায়ণের উদ্যান এবং রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহগুলির স্থাপত্য অবশ্যদ্রষ্টব্য।

উত্তরায়ণ ছাড়া শান্তিনিকেতনের অন্য জায়গাগুলি নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখা যেতে পারে। তার মধ্যে ছাতিমতলা, উপাসনাগৃহ, শান্তিনিকেতন বাড়ি, কলাভবন এবং তৎসংলগ্ন স্থাপত্যকর্ম, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের উত্তরে ছোটো খোয়াই পেরিয়ে বল্লভপুর অভয়ারণ্য। হাতে সময় থাকলে অভয়ারণ্যে এসে হরিণ দেখে যেতে পারেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব দেখতে হলে আগে থেকে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। উৎসবগুলির মধ্যে পৌষ উৎসব এবং বসন্তোৎসব উল্লেখযোগ্য।

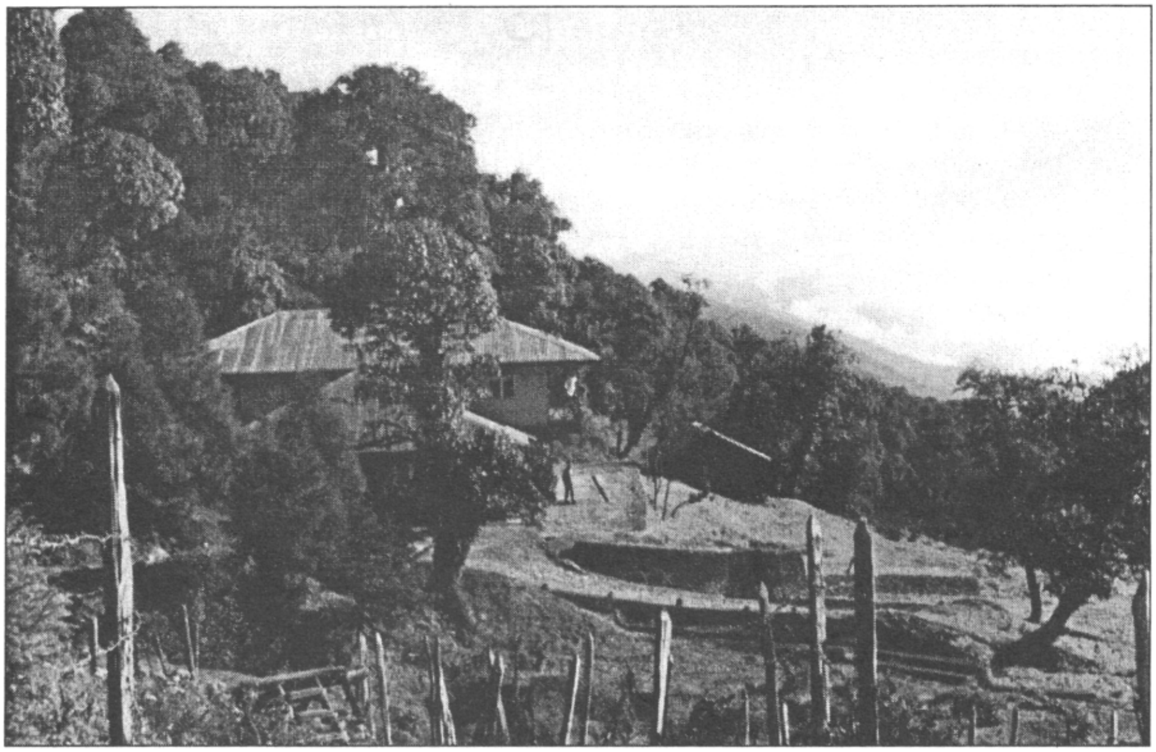
ছবি কাজল বিশ্বাস

সান্দাকফু-ফালুট

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

হিমালয়ের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ বরাবরই প্রবল। জ্ঞানার্জন, তীর্থযাত্রা বা শুধুমাত্র অচেনা সুন্দরকে জানার জন্যই বারবার বঙ্গসন্তানরা হিমালয়ের পথে পা বাড়িয়েছেন। সেই যে সহস্র বছর আগে অতীশ দীপঙ্কর দুর্গম তিব্বতের পথে পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাগ অফ করেছিলেন তারপর থেকেই এই অভিযাত্রা চলছে। আর এখনতো দলে দলে বাঙালি তরুণ প্রায় বছরভর মিলাম থেকে খাটলিং হিমবাহ পর্যন্ত বিভিন্ন চেনা-অচেনা রুট-এ চষে বেড়াচ্ছেন। এর সঙ্গে আছে মাঝারি থেকে বড়োসড়ো উচ্চতার শৃঙ্গ জয়ের অভিযান। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থেকে অর্থের অভাব কোনো কিছুই তাঁদের এই নেশা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন না। বঙ্গসন্তানদের এই হিমালয় ভ্রমণ কালক্রমে ভারতের অন্য প্রদেশের বা বিদেশের আগ্রহী পর্যটকদেরও হিমালয়প্রেমী করে তুলেছে। পায়ে হেঁটে হিমালয়ের অসংখ্য অপূর্ব সুন্দর জায়গায় যাওয়া যায় এবং অনেকে যাচ্ছেন। এইসব জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম আমাদের এই রাজ্যের সান্দাকফু ও ফালুট। এই দুই জায়গা থেকেই হিমালয়ের (ও পৃথিবীর) উচ্চতম পর্বতচূড়া মাউন্ট এভারেস্ট ও দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতচূড়া (পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়) কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান। প্রতি বছরই সান্দাকফু ও ফালুটে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে আগত বিদেশি পর্যটকদের একটি বড় অংশের গন্তব্যস্থল এখন সান্দাকফু ও ফালুট। বরফাচ্ছাদিত তুষারশৃঙ্গগুলি ছাড়াও সান্দাকফু ফালুট পথের বৈশিষ্ট্য এই পথযাত্রার সঙ্গী অসাধারণ অরণ্য। বর্তমানে এই অরণ্যটি সিংহালিলা





গৈরিবাস ট্রেকার্স হাট

ন্যাশনাল পার্ক নামে পরিচিত হয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে এই পথে নানা রঙের রডোডেনড্রন ও অন্যান্য বনজ ফুলের মেলা বসে যায়। আবার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নীল আকাশের গায়ে আঁকা হয়ে থাকে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি। আর প্রবল শীত উপেক্ষা করে যদি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে আসা যায় তবে পাওয়া যাবে এক অচেনা বরফের দেশকে।

সান্দাকফু-ফালুট এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে দার্জিলিং-এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের এই জায়গা দুটি সিংহালিলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে অবস্থিত। জাতীয় উদ্যানের পশ্চিমে নেপাল এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বে সিকিম রাজ্যের অবস্থান। কাঞ্চনজঙ্ঘার (৮৩৩৫ মিটার) পূর্ব দিকে সিংহালিলা রেঞ্জটি তিস্তা নদীর উপত্যকা। আর পশ্চিম দিকটি (নেপাল) তামুর নদের উপত্যকা, যেটি আবার কোশি নদের একটি উপ-নদ। ১৮৮২ সালে তৎকালীন সিংহালিলা অরণ্যটি ব্রিটিশ সরকার সিকিম রাজের কাছ থেকে কিনে নেয়। ১৯৮৬ সালে এই অরণ্যটি জাতীয় উদ্যান বলে ঘোষিত হয়েছে।

এপ্রিল-মে মাসে এই পথে নানা রঙের রডোডেনড্রন ও অন্যান্য বনজ ফুলের মেলা বসে যায়। আবার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নীল আকাশের গায়ে আঁকা হয়ে থাকে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি।

মানেভঞ্জন

সান্দাকফু-ফালুটের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু হয় মানেভঞ্জন থেকে। নিউজলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং আসার জন্য এখন প্রচুর যানবাহনের ব্যবস্থা হয়েছে। নিজেরা গাড়িভাড়া করে মানেভঞ্জনে এলে হাজার থেকে এগারোশো টাকার মধ্যে। টাটা সুমো বা কমান্ডার জিপ ভাড়া পাওয়া যায়। নচেৎ দার্জিলিং-এর পথে ঘুম-এ নেমে পড়ে শাট্‌ল জিপ-এ মানেভঞ্জন পৌঁছনো যায়। শিলিগুড়ি থেকে এ পথের দূরত্ব ৮৫ কিলোমিটার। সময় লাগে ঘণ্টাচারেক। প্রথমদিন মানেভঞ্জন পৌঁছে, এখানে থেকে যাওয়াই ভালো। থাকার জন্য দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ট্রেকার্স হাট ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রাইভেট লজ আছে। একশো থেকে দেড়শো টাকার মধ্যে সব লজেই দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর পাওয়া যায়। পোর্টার কাম গাইডও এখান থেকে নিলে ভালো হয়। পোর্টার ২৫/৩০ কেজি ওজন বহন করেন। পার্বত্য পরিষদ ও বনবিভাগ এঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এঁরা পর্যটককে জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন গাছপালা চিনিয়ে দেন। পোর্টার কাম গাইডের দৈনিক পারিশ্রমিক ২৫০ টাকা। তাঁর খাওয়ার দায়িত্ব পর্যটক বহন করলে পারিশ্রমিক ২০০ টাকা।

টংলু

মানেভঞ্জন থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। সকালে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই ভালো। পাহাড়ে বেলা বাড়ার সঙ্গেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু করে। টংলু পৌঁছতে প্রায় তিন হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। দূরত্ব এগারো কিলোমিটার। মানে থেকেই নেপাল পথের বাঁ ধারে। পথে পড়বে ছোটো দুটি গ্রাম। প্রথমে চিত্রে। প্রথম বিরতি। চা পান করে তরতাজা হয়ে আবার পথ চলা। এরপর মেঘমা। টংলু এখান থেকে আর দু কিলোমিটার পথ। অনেকেই আজকাল ডানহাতি পথে টংলু না গিয়ে বাঁদিকে টুমলিং-এ নেমে যান। এতে টংলুতে

ওঠার শেষ চড়াই ভাঙতে হয় না। কিন্তু টংলুর একমাত্র থাকার জায়গা পার্বত্য পরিষদের ট্রেকার্স হাট। এখান থেকে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশ সদয় হলে অসাধারণ। আর রাতে ট্রেকার্স হাট থেকে আলোকজ্জ্বল দার্জিলিং, টংলুর আর এক আকর্ষণ।

ধোতরে

মানেভঞ্জন থেকে চড়াই ভেঙে যাঁরা টংলু আসতে চাইবেন না তাঁদের জন্যে রয়েছে একটি বিকল্প পথ। মানে থেকে সকালে রিম্বিকগামী যেকোনো গাড়িতে উঠে চলে আসতে হবে ধোতরে। এখানে ইন্দিরা ছেত্রীর চায়ের দোকানে নাস্তা সেরে রওনা দিতে হবে টংলু। হাঁটাপথে পাঁচ কিলোমিটার। চড়াই ভাঙতে হবে হাজারখানেক ফুট। এ পথের স্নিগ্ধ গভীর অরণ্য পথশ্রমকে অনেক লাঘব করে।

টুমলিং

টংলু থেকে তিন কিলোমিটার পথ টুমলিং। পুরো রাস্তাটাই উৎরাই। মেঘমা স্কুলের শিক্ষিকা নীলাদেবী ছেত্রীর শিখর লজ এখন এপথের অন্যতম আকর্ষণ। টংলুতে না থেকে অনেকেই এখন টুমলিং-এ প্রথম দিনের যাত্রাবিরতি দেন। টুমলিং-এ সিংহালিলা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য বনবিভাগ-এর কাছে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে এনট্রি ফি জমা দিতে হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেও তুষার শৃঙ্গরাজি দর্শনীয়।

গৈরিবাস

টুমলিং থেকে নেপালের জৌবাড়ি হয়ে একটি পথ এসে পৌঁছেছে গৈরিবাস। এপথে ল্যান্ডরোভার চলে। অপর একটি পথও গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছেছে এখানে। দূরত্ব কমবেশি ৭ কিলোমিটার। এখানে থাকার জন্য আছে পার্বত্য পরিষদের ট্রেকার্স হাট। গৈরিবাস গ্রামে কয়েক ঘর মানুষের বাস। তাঁরা নেপালের নাগরিক। জেলা ইলম। গ্রামে মটরশুঁটি, ভোটমুলো ও আদার চাষ হয়। তিনটি গিরিশিরার মধ্যে সবুজের আস্তরণে মোড়া গ্রাম গৈরিবাস। সিংহালিলা বনের সবচাইতে আকর্ষণীয় প্রাণী রেড পান্ডার একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে এখানে। বনবিভাগের উদ্যোগে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে কয়েকটি রেড পান্ডা এনে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের বনে ছাড়া হয়েছে। অনেকে দ্বিতীয়দিনের যাত্রাবিরতি ঘটান গৈরিবাসে। তবে আর একটু পথ এগিয়ে কালাপোখরিতে থাকলে তৃতীয়দিনে সান্দাকফু পৌঁছতে পরিশ্রম কম হয়।

কালাপোখরি

এই নামের অর্থ কালো জলের পুকুর (পোখরি)। সত্যিই পুকুরের জলের রঙ কালচে। জল কিন্তু খুবই পরিষ্কার। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ এই জলাশয়টিকে খুবই পবিত্র মনে করেন। চারিদিকেই নানা রঙের পতাকা (ধ্বজা) উড়ছে। এঁরা মনে করেন অশুভ শক্তির প্রভাব এই উড্ডীয়মান পতাকা রোধ করবে। পুকুরটিকে ডানদিকে রেখে গ্রামে প্রবেশের পথ। প্রবেশপথেই একটি প্রাচীর বা মণি দেওয়াল যার উপর বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বাণী উৎকীর্ণ আছে। গৈরিবাস থেকে কালাপোখরির মধ্যে পড়ে কাঁইয়াকাটা বলে গ্রামটি। এ পর্যন্ত আসতে কিঞ্চিৎ চড়াই আছে। কাঁইয়াকাটায় চা পানের বিরতি নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হয়। কালাপোখরিতে থাকার জন্য গোটা তিনেক প্রাইভেট লজ আছে। ব্যবস্থা ভালো। এখানে একটি টেলিফোন বুথ আছে এবং দেখলাম, পর্যটকরা পরিপূর্ণভাবে সেটির সহায়তা গ্রহণ করছেন।

সান্দাকফু

কালাপোখরি থেকে সান্দাকফুর দূরত্ব বেশি নয়। ছয় কিলোমিটার। চার কিলোমিটার পথ পেরোনোর পর পড়বে বিকেভঞ্জন। এরপরই একটি বড় চড়াই ভাঙতে হবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য। বিকে থেকে একটি পায়েচলা পথ নেমে গিয়েছে রিম্বিকের দিকে। সান্দাকফু একটি ছোট্ট জনপদ। কয়েক ঘর মানুষের বাস। তাঁরা আবার কেউ কেউ নেপালের নাগরিক। থাকার জন্য রয়েছে পার্বত্য

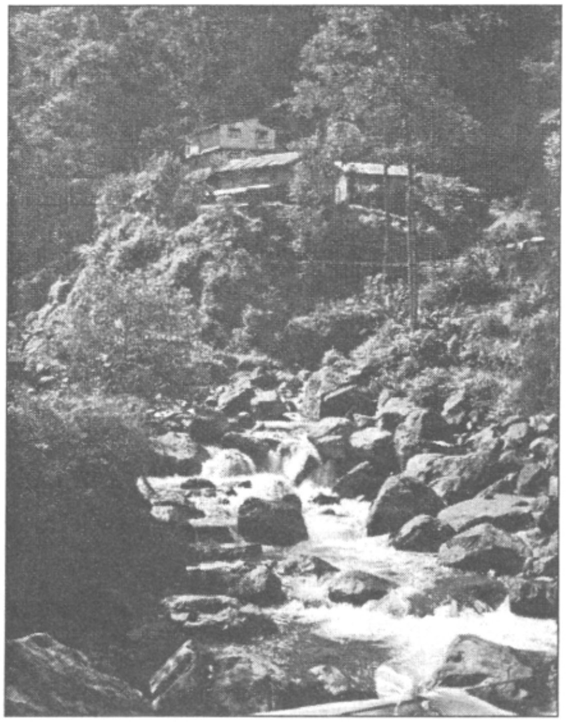
ট্রেকিং পথের দূরত্ব

মানেভঞ্জন—টংলু	১১	কিমি
টংলু—কালাপোখরি	১৫	
কালাপোখরি—সান্দাকফু	০৬	
সান্দাকফু—ফালুট	২১	
ফালুট—গোর্কে	১৫	
গোর্কে—শ্রীখোলা	১৬	
শ্রীখোলা—রিম্বিক	০৬	,,
মোট	৯০	কিমি

উচ্চতা

মানেভঞ্জন	—	৬,৯৯০	ফুট
মেঘমা	—	৯,৫০০	
টংলু	—	১০,০৫০	
গৈরিবাস	—	৮,৫৯০	
কালাপোখরি	—	১০,১৮০	
সান্দাকফু	—	১১,৯১০	
সবর গ্রাম	—	১১,৫৮০	
ফালুট	—	১১,৭৯০	
গোর্কে	—	৭,৫৩০	
রাম্মাম	—	৮,৩৯০	
রিম্বিক	—	৭,৪৯০	,,

টুমলিং-এ সিংহালিলা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য বনবিভাগ-এর কাছে মাথাপিছু পঁচিশ টাকা করে এনট্রি ফি জমা দিতে হয়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেও তুষার শৃঙ্গরাজি দর্শনীয়।



শ্রীখোলা

পরিষদের তিনটি ট্রেকার্স হাট। এছাড়া আছে পি ডব্লিউ ডি, বনবিভাগ ও ডি আই ফান্ডের বাংলো। একটি প্রাইভেট লজও আছে এখানে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সান্দাকফু থেকে এভারেস্ট পরিবার ও কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিবারের বিভিন্ন তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গগুলি দৃশ্যমান। ভোরের প্রথম আলো এসে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে প্রতিফলিত হয়ে এক মায়াবি সোনালি আভার সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয় পরিবারের অন্য সদস্যরা। বাঁদিক (পশ্চিম) থেকে কুম্ভকর্ণ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নরসিম, পাণ্ডিম, কাবরু, কাবরুডোম, সিনিয়ালচু, গোচালা, জোঙরি ইত্যাদি। কুম্ভকর্ণ থেকে জোঙরি পর্যন্ত এই তুষার শৃঙ্গগুলি দেখলে মনে হয় যেন শায়িত মনুষ্যমূর্তি। এই দৃশ্যটিকে বলা হয় 'দি স্লিপিং বুদ্ধ'। আরও পশ্চিমে তিনটি শৃঙ্গ একত্রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। এদের বলা হয় 'থ্রি সিস্টারস পিক'। আরও পশ্চিমে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। সঙ্গে এই পরিবারের লোৎসে, মাকালু ও অন্যান্য শৃঙ্গগুলি। সান্দাকফু থেকে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখাও এক মনোরম অভিজ্ঞতা। একটি অতিরিক্ত দিনও থাকা যেতে পারে সান্দাকফুতে।

ফালুট

সান্দাকফু থেকে ফালুট-এর দূরত্ব একুশ কিলোমিটার। উপযুক্ত সঙ্গী ও উৎসাহ থাকলে একদিনেই পৌঁছনো যেতে পারে। ফালুটে থাকার জায়গা বলতে শুধুমাত্র সেই ট্রেকার্স হাটই সমতল। একদিনে ফালুট পৌঁছতে না পারলে সবরগ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে মোলে গ্রামে আরও একটি ট্রেকার্স হাট আছে। সেখানে একদিন থেকে ফালুট যাওয়া যায়। ফালুট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও এভারেস্ট যেন আরও কাছে চলে আসে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ফালুট যাবার পথেই তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পথ চলা যায়। যাঁরা ফালুট দেখে ফিরবেন তাঁরা একরাত ওখানে কাটিয়ে নেমে আসবেন গোর্কে গ্রামে। এখানেও থাকার জন্য আছে ট্রেকার্স হাট। গোর্কে একটি চিরহরিৎ উপত্যকা। এখানে আছে উচ্ছল গোর্কেখোলা। খোলা অর্থাৎ ঝরনা বা পাহাড়ি নদী। গোর্কেতে একরাত কাটিয়ে সামানদান উপত্যকা হয়ে নেমে আসা যাবে রাম্মাম অথবা শ্রীখোলাতে। সব জায়গাতেই ট্রেকার্স হাট আছে। রাম্মাম-এ রাত্রিবাস করলে পরদিন শ্রীখোলা হয়ে সরাসরি রিম্বিক নেমে আসা যায়। তবে শ্রীখোলাতে নেমে উচ্ছল শ্রীখোলার পাশে একটি দিন কাটালে ভাল লাগবে। এখানে গোপারমা লজটি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় চলছে। ভারি সুন্দর করে সাজানো। শ্রীখোলা থেকে রিম্বিক ছয় কিলোমিটার পথ। ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে নেমে আসতে। রিম্বিক থেকে দার্জিলিং যাবার গাড়ি সকাল সাড়ে ছটা ও বেলা বারোটায় ছাড়ে। রিম্বিক-এ থাকতে হলে প্রাইভেট হোটেল আছে। থাকার জায়গার অভাব হবে না।

যাঁরা গোর্কে থেকে সিকিম যেতে চান তাঁরা দশ কিলোমিটার হেঁটে রিবডি পৌঁছবেন। এখানে গ্রামের লোকের বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া যায়। রিবডি থেকে জিপে সিকিমের জোড়থাং আসা যায়। জোড়থাং থেকে শিলিগুড়ি আসার বাস ও জিপ দুইই পাওয়া যাবে।

যাঁরা সান্দাকফু থেকে ফিরতে চান তাঁরা সিংহালিলা জাতীয় উদ্যানের গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে নামবেন গুরদুম গ্রামে। গোটা পথেই অরণ্যের বৃক্ষরাজি আপনার সঙ্গী থাকবে। নানা প্রজাতির পাখিও চোখে পড়বে। বসন্তে পাগলকরা রডোডেনড্রন বা গুরাস ফুল আপনাকে স্বাগত জানাবে। গুরদুমে ডেন শেরপার হিমালয়ান লজ-এ থাকার আশ্রয় পাবেন। এটিও রুচিসম্মতভাবে সাজানো। গুরদুম থেকে নামার সময় পাতামখোলা আপনার সঙ্গী হবে। টিমজুরে গ্রাম ছাড়িয়ে আসবেন শ্রীখোলায়। তারপর রিম্বিকের পথে নেমে আসা। সেপি গ্রাম ছাড়িয়ে রাজাবীর-এ এসে পাবেন রাম্মাম খোলাকে। সে এসে মিলিত হচ্ছে শ্রীখোলার সঙ্গে। ছোটো ছেলেমেয়েরা দৌড়ে আসবে। বলবে 'মিঠাই দো'। সঙ্গে লজেন্স রাখবেন, ওদের আনন্দবৃদ্ধি করবার জন্য। এরপর রিম্বিক। সেখান থেকে ঘরে ফেরার পালা।

সান্দাকফু-ফালুটের পথে ট্রেকার্স হাট বুকিং করতে পারেন দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ-এর কলকাতা দপ্তর থেকে। ঠিকানা কলকাতা ৪ শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১, দূরভাষ ২২৮২-৫৮১৩/৭৭৩১। দার্জিলিং দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল, সিলভার ফার বিল্ডিং, ম্যাল, দার্জিলিং, দূরভাষ ০৩৫৪-২৫৪২১৪, ২৫৪৮৭৯, ২৫৫৩৫১।

ছবি : লেখক

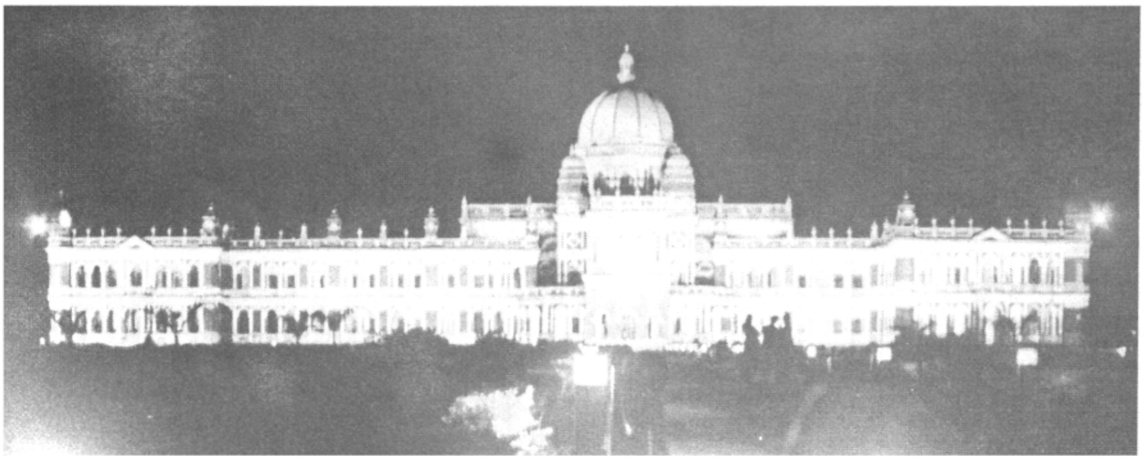
গোর্কে একটি চিরহরিৎ উপত্যকা। এখানে আছে উচ্ছল গোর্কেখোলা। খোলা অর্থাৎ ঝরনা বা পাহাড়ি নদী। গোর্কেতে একরাত কাটিয়ে সামানদান উপত্যকা হয়ে নেমে আসা যাবে রাম্মাম অথবা শ্রীখোলাতে।

অপরূপা ডুয়ার্স

কৌশিক ভট্টাচার্য

একসময় উত্তরবঙ্গ বলতে মালদহের ওপাশ থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এইসবই বোঝাত। আর যোগাযোগের জন্য তোরণদ্বার হিসাবে শিলিগুড়ির একটা পরিচিতি ছিল। বাকি সব তো গভীর জঙ্গল। যেখানে দিনের বেলাতেও পালে পালে হাতি, বাঘ আর গণ্ডার ঘুরে বেড়ায়। আর এদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় ও চা বাগান। ধীরে ধীরে দার্জিলিং, কালিম্পং পুরোনো হয়ে গেল। পর্যটনপ্রিয় বাঙালি খুঁজে নিতে শুরু করল বেড়ানোর নতুন জায়গা। বৈচিত্র্যের খোঁজে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি শুরু হল। উন্মোচিত হল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর, অসংখ্য নদী-নালা-ঝোরা দিয়ে খণ্ডিত গভীর গহন বনভূমি ও সবুজ শ্যামল চা বাগিচায় ভরা দিগন্ত বিস্তৃত এক মোহময়ী সমতলভূমি—অনন্য রূপময়ী ডুয়ার্স।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ডুয়ার্স বা তরাই অঞ্চল অবস্থিত। ডুয়ার্স বিখ্যাত তার বৈচিত্র্যময় নিবিড় অরণ্য ও চা বাগানের জন্য। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে রূপসী ডুয়ার্সের আয়তন ৪৭৫০ বর্গ কিমি, যার মধ্যে ১২৫০ বর্গ কিমি অরণ্য। ডুয়ার্সের বুকে গড়ে উঠেছে ১৫২টি চাবাগান। রোমাঞ্চে ভরা ডুয়ার্সের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, জয়ন্তী, সঙ্কোশ, ডায়না, মূর্তি, কালজানি ইত্যাদি পাহাড়ি নদী। নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর আবাস এই ডুয়ার্স অঞ্চলে আর্দ্রতা খুব বেশি। বৃষ্টিপাতের পরিমাপ বছরে ৭০০০ মিমিরও বেশি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নিবিড় অরণ্য। ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রায় চার হাজার প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের



সন্ধান পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে আড়াইশো প্রজাতির ফার্ন। আছে বৈচিত্র্যময় অর্কিডের সম্ভার। এছাড়াও শোনা যায় প্রায় চারশো প্রজাতির পাখিদের কাকলি।

ডুয়ার্সের বেশির ভাগটাই জলপাইগুড়ি জেলায়। পূর্ব হিমালয়ের ভুটান পাহাড় ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্ত রচনা করেছে। এর অপর সীমানা কোচবিহার জেলায়। টি, টিম্বারের সঙ্গে সঙ্গে ট্যুরিজমও জনপ্রিয় হচ্ছে অপরূপা ডুয়ার্সে। ডুয়ার্সের দুয়ার হিসাবে বেছে নেওয়া যায় দুটি প্রান্তিক শহরের যে কোনো একটিকে—শিলিগুড়ি অথবা কোচবিহার। শুরু করা যাক পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম জেলাশহর কোচবিহার দিয়ে।

কোচবিহার

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত ছবির মতো সাজানো ছোট শহর কোচবিহার। শহরের নামকরণ সম্ভবত কোচ জনজাতি থেকে হয়েছে। কোচবিহার শহরের আয়তন ৮.৯০ বর্গকিমি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম পরিকল্পিত প্রাচীন শহর হিসাবে কোচবিহারকে গণ্য করা হয়। শহর নির্মাণে যে সুচারু পরিকল্পনা ছিল, তা শহরটি ঘুরলেই বোঝা যায়। রাস্তাগুলি ঋজু সরল এবং দুধার গাছে ছাওয়া। গাছ-গাছালিতে পূর্ণ এমন শহর খুব কমই দেখা যায়। গাছের জন্যই এ শহরের উষ্ণতা মাত্রাছাড়া হয় না। প্রখর গ্রীষ্মেও অসহনীয় উত্তাপের সঙ্গে কোচবিহারবাসীরা পরিচিত নন।

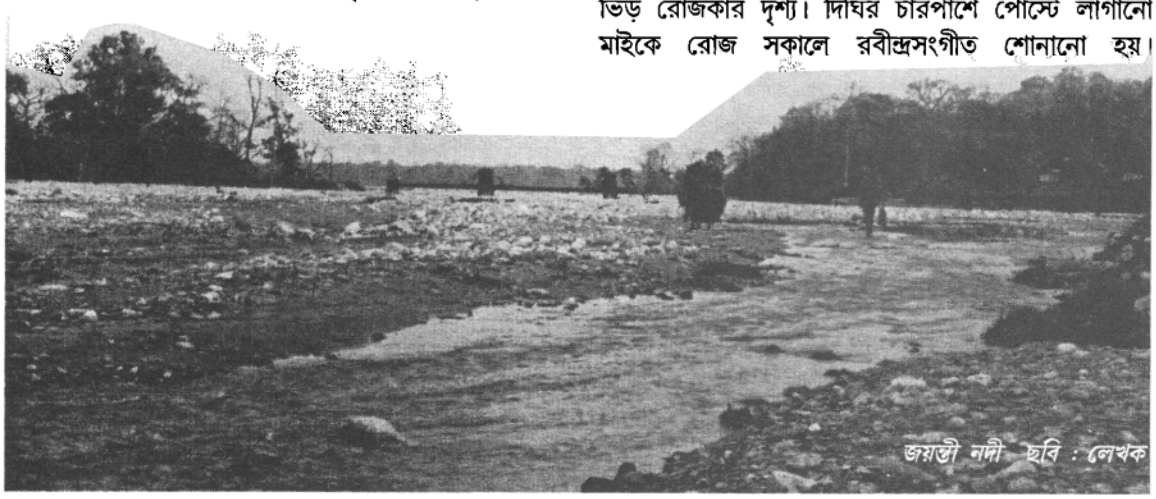
শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য কোচবিহার রাজপ্রাসাদ। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ইতালীয় স্থাপত্যরীতিতে এই রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করান ১৮৮৭ সালে। খরচ হয় ৮,৭৭,২০৩ টাকা। রোমের সেন্ট পিটার্সের অনুকরণে নির্মিত এই সুরম্য প্রাসাদটির প্রধান স্থপতি ছিলেন এফ ব্রাকলে। নির্মাণসংস্থা ছিল ম্যারিলিয়র অ্যান্ড এডওয়ার্ডস। ৫১,৩০৯ বর্গ ফুট আয়তনের এই প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ৩৯৫ ফুট ও প্রস্থে ২৯৬ ফুট। একতলা-দোতলা মিলিয়ে মোট ৬৯টি ঘর যার মধ্যে ১৫টি শয়নকক্ষ। প্রাসাদটির নির্মাণে রাজমহল থেকে এসেছিল মার্বেল পাথর। কাচ এসেছিল বেলজিয়াম থেকে। একতলায় অবস্থিত দরবার হল দৈর্ঘ্যে ৭২ ফুট ও প্রস্থে ৬৫ ফুট। মেঝেতে খোদিত আছে রাজপরিবারের প্রতীক দুই সিংহ। এর গম্বুজাকৃতি ছাদের উচ্চতা প্রায় ১২৫ ফুট। ছাদে ধাতুনির্মিত চূড়া ও চূড়ার ওপর বাতিস্তম্ভ সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গম্বুজের ভিতরের দিকেও দেওয়ালের ওপরের অংশ রঙিন জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকৃত। একটি টানা বারান্দা ঘিরে রেখেছে হলটিকে।

রাজবংশের গরিমা লোপ পাওয়ার পর প্রাসাদটি অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়। বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রাসাদটি ও সংলগ্ন স্থানের সংস্কার চলছে। একতলার চারটি ঘরে গ্যালারি খোলা হয়েছে। চেষ্টা চলছে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাসাদের হৃত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে একটি মিউজিয়ম তৈরি করার। গ্যালারিতে বিভিন্ন সময়ের রাজা-রানিদের পোর্ট্রেট, জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক মূর্তি, বিভিন্ন লোকবাদ্য, কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী কোচ, রাভা, মেচ ইত্যাদি জনজাতির বিভিন্ন উৎসবের মুহূর্ত ও তাঁদের ব্যবহৃত বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মডেল স্থান পেয়েছে।

প্রাসাদের চারপাশে চাইনিজ ঘাসে ছাওয়া সুবিশাল লন, বাগান, জলাশয় ও তাতে প্রাসাদের প্রতিচ্ছবি—এ সবই প্রাসাদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। গাঢ় বাদামি ও সাদা রঙে রঞ্জিত প্রাসাদটির সামনের দিক ও গেট থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত রাস্তাটি আলো দিয়ে সজ্জিত। প্রতি শনি ও রবিবার এবং বিশেষ ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলায় আলোগুলি জ্বালান হলে প্রাসাদটি থেকে আর চোখ ফেরানো যায় না। প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে সন্ধ্যাবেলায় আলো ও ধ্বনির মাধ্যমে ফোয়ারা প্রদর্শনীও করা হয়। সামান্য প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে এইসব আনন্দগুলি উপভোগ করা যায়।

কোচবিহারকে দিঘির শহর বললে অত্যুক্তি হয় না। শহরের বিভিন্ন অংশে রয়েছে সুবৃহৎ জলাশয় বা দিঘি। রকমারি তাদের নাম। শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে দুটি দিঘি—সাগরদিঘি ও বৈরাগীদিঘি। এছাড়া আছে নরসিংহদিঘি, লালদিঘি প্রভৃতি। শহরের বৃহত্তম সাগরদিঘির চারপাশে বাঁধানো রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণকারীর ভিড় রোজকার দৃশ্য। দিঘির চারপাশে পোস্টে লাগানো মাইকে রোজ সকালে রবীন্দ্রসংগীত শোনানো হয়।

শহর নির্মাণে যে সুচারু পরিকল্পনা ছিল, তা শহরটি ঘুরলেই বোঝা যায়। রাস্তাগুলি ঋজু সরল এবং দুধার গাছে ছাওয়া। গাছ-গাছালিতে পূর্ণ এমন শহর খুব কমই দেখা যায়।


জয়ন্তী নদী ছবি : লেখক

চারপাশের রাস্তায় জেলার প্রধান সরকারি দপ্তরগুলি রয়েছে। দিঘির জলে শীতকালে পরিযায়ী পাখির ভিড় দেখা যায়।

কোচবিহার শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ মদনমোহন মন্দির বা মদনমোহন বাড়ি সাগরদিঘি থেকে সামান্য দূরে বৈরাগীদিঘির বিপরীতে অবস্থিত। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৮৮৫-৮৯-য়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। বেশিরভাগ কোচবিহারবাসীর গৃহদেবতা এই মদনমোহন দেব। তার মন্দিরটি কোচবিহারবাসীদের কাছে একটি মিলনস্থল। সম্পূর্ণ সাদা রঙে রঞ্জিত এই মন্দিরটি বাংলার চারচালা রীতিতে তৈরি হলেও বাঁকানো কার্নিশের ওপর একটি গম্বুজ রয়েছে। মূল দেবতা মদনমোহনের ঘরের ওপর গম্বুজটি স্থাপিত। প্রবেশদ্বারের ওপর প্রাচীন নহবতখানা আজও রয়েছে। বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণে সুন্দর ফুলের বাগান মন্দিরটির শোভা বৃদ্ধি করেছে। সন্ধ্যারতির সময় মন্দির ও প্রাঙ্গণ রোজ আলোকমালায় সজ্জিত হয়। ধূপ-ধুনোর গন্ধে ও প্রচুর ভক্তের ভিড় মন্দিরের পরিবেশকে এক অন্য মাত্রা দেয়।

মদনমোহনের ডানপাশের ঘরে কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি, বাঁদিকের ঘরে অষ্টধাতুর জয়তারা, অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী ও মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি রয়েছে। এছাড়া মূল মন্দিরের দুপাশে দুটি মন্দিরে শোভা পাচ্ছে ভবানী দেবী ও আনন্দময়ী কালী। সকাল ছটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। তবে দুপুরবেলা মূল মন্দিরের কোলাপসিবল গেট বন্ধ থাকে।

প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমায় (রাস পূর্ণিমা) মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র করে দশ দিনের জন্য বিরাট মেলা বসে ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে দেব-দেবীদের শোভাযাত্রা করে মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এটি কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ মেলা ও প্রধান উৎসব। রাস পূর্ণিমা ছাড়াও শ্রাবণের ঝুলন ও ভাদ্রের জন্মাষ্টমীতেও উৎসব হয়।

কোচবিহার শহরে চলতে ফিরতে চোখে পড়ে ইউরোপীয় স্থাপত্যে গড়ে ওঠা ঘর-বাড়ি। দেখে নেওয়া যায় অভিজাত জেনকিনস্ স্কুল, বিপরীতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ বা ভিক্টোরিয়া কলেজ (পুরোনো নাম), পুরানি মসজিদ, চার্চ। সাহিত্যসভার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে নেওয়া যায় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে প্রচলিত নারায়ণী মুদ্রা। এই লাইব্রেরিতে কোচবিহার ও আশপাশের নানা নিদর্শন ও তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা নানা লৌকিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে তথ্য রক্ষিত আছে। আর আছে সাগরদিঘির কাছে কোচবিহার রাজপরিবারের দুর্গামন্দির 'বড়দেবী বাড়ি'। স্থাপত্যে ইউরোপীয় ছাপ সুস্পষ্ট।

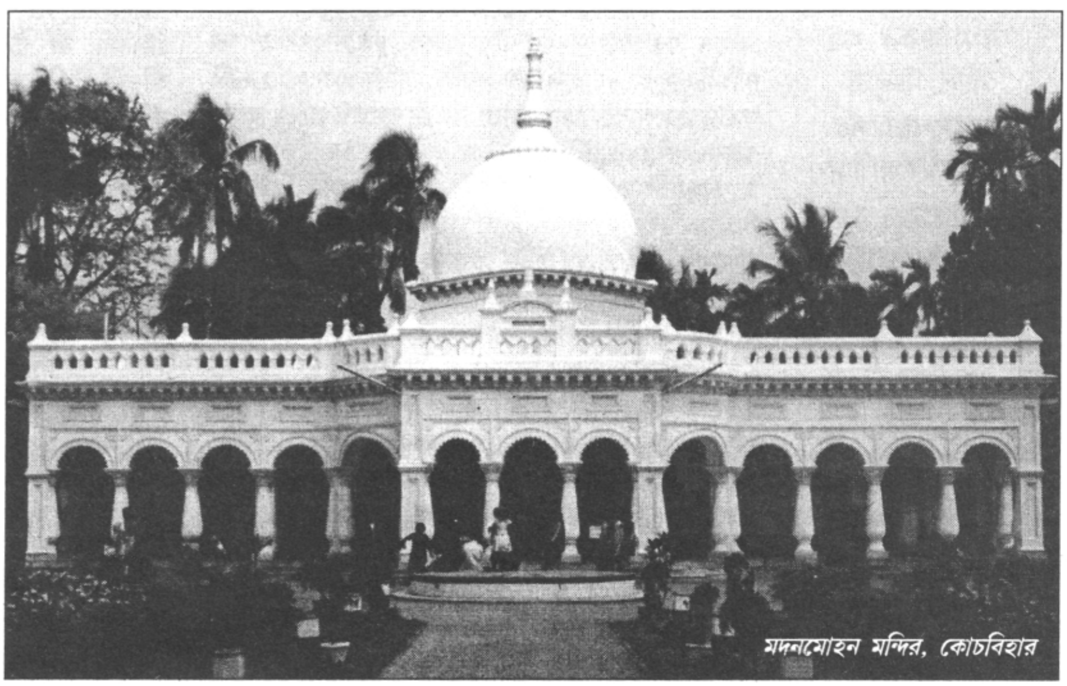
কোচবিহার থেকে গাড়িতে বা ট্রেনে তোর্সা পেরিয়ে দিনহাটা পৌঁছে দেখে নেওয়া যায় গোঁসানিমারির কামতেশ্বরী বা গোঁসানি (ভগবতী) দেবীর মন্দির। ১৬৬৫ সালে মহারাজা প্রাণনারায়ণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। এটিও মদনমোহন মন্দিরের রীতিতে নির্মিত। বৈশাখ ও মাঘ মাসে মন্দিরে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কাছেই রয়েছে ৬০০ বছরের প্রাচীন গোঁসানিমারি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। গোঁসানিমারি কোচবিহার জেলার অন্যতম পুরাকীর্তি অঞ্চল। গবেষকদের মতে পালযুগের শেষ ও সেনযুগের প্রথম দিকের সমসাময়িক এই রাজত্বের অতীত উদ্ধারের কাজ চলছে।

দিনহাটা থেকে ১০ কিমি দূরে রাজ বাপাসুর প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবমন্দির। মন্দির গহ্বরে প্রবেশ করতে হলে সিঁড়ি দিয়ে ১০ ফুট নিচে নামতে হয়। এখানে শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট প্রতিষ্ঠিত। মন্দির প্রাঙ্গণের বিশাল পুকুরটি ও তাতে বসবাসকারী অসংখ্য কচ্ছপের দল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিব চতুর্দশীর সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরে বিশাল মেলা বসে।

উত্তরবঙ্গের নবতম আকর্ষণ ১৭৫ হেক্টরব্যাপী ওয়েটল্যান্ড বা জলাজমি রসিকবিল। শীতকালে এখানে পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে যায়। সারা বছরও কিছু না কিছু পাখি দেখা যায়। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে হল শামুকখোল, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, বক, টিয়া, লাল বনমুরগি এবং আরও অনেক চেনা-অচেনা পাখি।

রসিকবিলকে ঘিরে রয়েছে নাগুরহাট ও কোচবিহার রাজাদের এককালের মৃগয়াভূমি আটিয়ামোচর বনাঞ্চল।

সম্পূর্ণ সাদা রঙে রঞ্জিত এই মন্দিরটি বাংলার চারচালা রীতিতে তৈরি হলেও বাঁকানো কার্নিশের ওপর একটি গম্বুজ রয়েছে। মূল দেবতা মদনমোহনের ঘরের ওপর গম্বুজটি স্থাপিত।


মদনমোহন মন্দির, কোচবিহার

গড়ে উঠেছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। শাল, সেগুন, শিশু, মিনজুরির এই বনাঞ্চলে একটি মৃগদাব তৈরি হয়েছে। করা যায় নৌবিহার।

কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে ২ ঘণ্টায় রসিকবিল যাওয়া যায়। তবে কামাখ্যাগুড়ি হয়ে ·৪ কিমি দূরের এই রসিকবিলে আসায় সুবিধা বেশি। থাকার সুব্যবস্থা আছে।

জয়ন্তী ও বক্সাপাহাড়

কোচবিহার থেকে ২৪ কিমি দূরের আলিপুরদুয়ার হয়ে আরও ৩০ কিমি দূরে নদী, পাহাড় আর ঘন অরণ্য ঘেরা গ্রাম জয়ন্তী। মাঝে পড়ে রাজাভাতখাওয়া। সমগ্র জয়ন্তী অঞ্চলটি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের 'কোর এরিয়া'য় অবস্থিত বলে দিনেরবেলাতেও গা-ছমছমে ভাব। অথচ ছবির মতো সুন্দর। চওড়া জয়ন্তী নদীর ওপারে ডলোমাইট পাহাড় শ্রেণি। চাঁদনি রাতে ফুলের বাগানে সাজানো বনবাংলোতে অথবা নদীর ধারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাংলোর দোতলায় থাকতে পারলে স্বর্গবাসের স্বাদ পাওয়া যায়।

জয়ন্তীর মূল আকর্ষণ দুটি। জয়ন্তী নদী ও মহাকাল মন্দির বা গুহা। ওপারে ডলোমাইট পাহাড়, তারও ওপাশে ভুটান আর এপারে জয়ন্তী গ্রাম, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত জয়ন্তী নদী। পাথরে ভরা শুকনো নদীখাত দেখে বোঝার উপায় নেই যে ১৯৯৩-য়ের প্রলয়ংকরী বন্যায় এই নদীরই ওপর ব্রিটিশ আমলের বিরাট লোহার সেতু দুপাশের অ্যাপ্রোচ রোড সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্মৃতি হিসাবে মাঝ নদীবক্ষে সেতুটির অবশিষ্ট কঙ্কাল এখনও রয়ে গেছে। নিসর্গ, শুধু নিসর্গ প্রিয় মানুষের জন্য জয়ন্তী। নির্জন, সবুজে ছাওয়া জয়ন্তীতে যখন আঁধার নামে, পাখির কাকলি কমে আসে, মগজ অবশ করা বনজ গন্ধে চারিদিক ভারি হয়ে ওঠে, তখন নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে কোনো এক তক্ষক তার তীক্ষ্ণ ডাকে বুঝিয়ে দেয় হয়তো পৃথিবীর সুন্দরতম স্থান এই জয়ন্তী। চারিদিকের সারি সারি পাহাড় থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস রাতের চোখে ঘুমের কাজল বুলিয়ে যায়।

জয়ন্তী থেকে ৫ কিমি দূরে জয়ন্তী মহাকাল গুহা মন্দির। ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি থেকে মহাকাল মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়। চলে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত। জয়ন্তী থেকে মহাকাল মন্দির পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের ব্যবহৃত পথটি ১৯৯৩-য়ের বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখন যাওয়ার উপায় জয়ন্তী নদীর শুকনো খাত। এই পথে নুড়ি ও বালির ওপর দিয়ে ৫ কিমি পথ হাঁটতে সময় লাগবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। রোমাঞ্চকর এই পথে কিছুটা এগোনোর পর বাঁদিকে দেখা যায় রঙ-বেরঙের নানা পাহাড় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। লাল, কালো, হলদে রঙের নানা পাহাড়গুলির রঙ ডলোমাইট, লোহা, গন্ধক ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য। ডানদিকে রয়েছে নীলাভ সবুজ ভুটান পাহাড়। আর দুপাশে সারাক্ষণই জঙ্গলের উপস্থিতি তো আছেই।

রোমাঞ্চকর এই পথে কিছুটা এগোনোর পর বাঁদিকে দেখা যায় রঙ-বেরঙের নানা পাহাড় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। লাল, কালো, হলদে রঙের নানা পাহাড়গুলির রঙ ডলোমাইট, লোহা, গন্ধক ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য।

পথ একসময় শেষ হয় জোড়াপাহাড় নামক স্থানে। দুপাশে উঁচু পাহাড়, মাঝে খরস্রোতা জয়ন্তীর ওপর নড়বড়ে সাঁকো। সাঁকো পার হয়ে সামনে আর একটি পাহাড়, যার মাথায় মহাকাল মন্দির বা গুহা। অনেকটা চারতলা মন্দিরের মতো। একতলায় চুনাপাথরের শিবলিঙ্গ। তার ওপরতলায় কল্পনার আশ্রয় নিলে কালীমূর্তি। এর ওপরে মহাকাল মন্দির। মন্দির তো নয়, একটি গুহা। প্রবেশ করতে হয় ছোটো একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে। উঁচু বেদির ওপরে মহাকাল মূর্তি। মোমবাতির আলোয় দেখা যায় চুন আর জলে তৈরি হওয়া স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাকমাইটের অপূর্ব কারুকার্য। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চাইবে না। প্রকৃতির কী অসাধারণ সৃষ্টি !

এবার যাওয়া যাক বক্সাদুয়ার বা বক্সা ফোর্ট। সিঞ্চুলা পাহাড়ে ২৬০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই বক্সাদুয়ার আসতে জয়ন্তী থেকে তিনটি পথ আছে। প্রথমটি ৯ কিমি দূরত্বে, মহাকাল মন্দির হয়ে। দ্বিতীয়টি ১১ কিমি দূরত্বের, পুকরি পাহাড়ের পাশ দিয়ে। এই দুটি পুরোপুরি ট্রেকরুট। সঙ্গে গাইড থাকা বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ ও বেশি ব্যবহৃত হয়। গাড়িতে ও হেঁটে ১২ কিমি দূরত্বের, সান্ত্রাবাড়ি হয়ে।

মনে রাখতে হবে বক্সাদুয়ার, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া ও আশপাশের স্থানগুলি সবই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মোট আয়তন ৭৬০ বর্গকিমি। ৩৩১ বর্গকিমি বনভূমি 'কোর এরিয়া' ও বাকিটা 'বাফার জোন'। এর মধ্যে ২৬৯ বর্গকিমি জুড়ে অভয়ারণ্য। ১৯৯২ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ১১৭ বর্গকিমি বনভূমি জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায়। জয়ন্তী, রায়ডাক, সঙ্কোষ, কালজানি, বালা, ভিমা নদীর তীরে তীরে বিস্তৃত অরণ্য, সবুজ পাহাড় আর নিস্তব্ধ-নির্জন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মন আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু এই অঞ্চলে হাঁটাচলা বা ট্রেকিং-এর সময় বন বিভাগের নিযুক্ত অভিজ্ঞ গাইডের তত্ত্বাবধান ভীষণ জরুরি। তাঁদের সাহায্য না নিয়ে নিছক অ্যাডভেঞ্চার করতে চাইলে বিপদ প্রতি পদে পদে।

জয়ন্তী থেকে আলিপুরদুয়ারমুখী পথে ৪ কিমি দূরে একটি মোড় আছে। এই মোড় থেকে ডানদিকে ৭ কিমি দূরে সান্ত্রাবাড়ি। এই পর্যন্ত গাড়ি আসে। পাহাড়ের পাদদেশের সান্ত্রাবাড়ি থেকে অরণ্যের মধ্য দিয়ে চড়াই-উতরাই পথে ৫ কিমি দূরের পাহাড়ের মাথায় বক্সা বনবাংলো পৌঁছতে হবে পায়ে হেঁটে। খুবই রোমাঞ্চকর এই পথ। বিশাল বিশাল মহীরুহ, লতানে গাছ, অর্কিড, গুল্ম আর ফার্নে ভরা রহস্যময় এই জংলি পথে সারাক্ষণই এক চাপা নিস্তব্ধতা সঙ্গী হয়। পাখির কাকলি আর ঝিঁঝির কনসার্ট ছাড়া যেন আর কোনো শব্দ পৃথিবীতে নেই। তবে অচেনা কোনো জান্তব শব্দ কানে আসতেই পারে। সে ক্ষেত্রে সাবধান। হয়তো সে কাছেই আছে। ব্রিটিশ আমলে বন্দীদের এই পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত বক্সা ফোর্টের জেলখানায়। গোপাল হালদার, প্রভাস লাহিড়ী,

নিকুঞ্জ সেন, হেমচন্দ্র ঘোষ, ত্রৈলোক্য মহারাজ প্রমুখ অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী এই দুর্গের জেলাখানায় বন্দীজীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের স্মৃতিচারণায় এই দুর্গের রোমাঞ্চকর কাহিনি ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এখানে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। থাকা যায় দুর্গসংলগ্ন বনবাংলোয় অথবা স্থানীয় ইকো ডেভেলমমেন্ট কমিটির পরিচালনায় ১৬ শয্যার ডর্মিটরিতে।

বক্সা, জয়ন্তী ও রাজাভাতখাওয়া ছাড়াও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীনে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর যেসব জায়গাগুলিতে বনবাংলো রয়েছে সেগুলি হল ভুটানঘাট, রায়ডাক, কুমারগ্রাম, নিমাতি, বারবিশা ও রায়মাটাং। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রত্যেকটি জায়গার সুযোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

জয়ন্তী থেকে ফেরার পথে বেড়িয়ে নেওয়া যায় রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতি বীক্ষণকেন্দ্র। অরণ্য সম্পর্কিত সংগ্রহে সমৃদ্ধ এই কেন্দ্রটি সময় নিয়ে ঘুরে দেখার মতো। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ছোট্ট জনপদ এই রাজাভাতখাওয়া। রয়েছে ছবির মতো চা-বাগান। ১৩২ রকমের অর্কিডের একটি অর্কিডোরিয়াম হয়েছে প্রকৃতি বীক্ষণকেন্দ্রের পাশে। আহত জংলি-জানোয়ারদের চিকিৎসার জন্য রাজাভাতখাওয়া হয়ে ওঠে তাদের সাময়িক আস্তানা। শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার রেলপথে রাজাভাতখাওয়া একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। থাকার জন্য রয়েছে বনবাংলো।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য

জয়ন্তী থেকে ৭০ কিমি আর আলিপুরদুয়ার থেকে ৫০ কিমি দূরে পূর্ব হিমালয়ের ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের জনপ্রিয়তম অভয়ারণ্য জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের স্থায়ী আবাস এই চিরসবুজ অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনে রাখার মতো। ২১৬ বর্গকিমি আয়তনের এই অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে তোর্সা, মালঙ্গী, হলং, শিশামারা, বুড়িতোর্সা, ভালুকা, কালিঝোরা নামের সুন্দর সব নদী। ১৯৭৬ সালে স্বীকৃতি পাওয়া এই অভয়ারণ্য গণ্ডার ছাড়াও বাঘ, চিতাবাঘ, শ্লথ ভাল্লুক, সম্বর, চিতল, বার্কিং ডিয়ার, বন্য শূকর, ভারতীয় বাইসন বা গউর, হাতি প্রভৃতি বনপ্রাণী ও অজস্র পাখির আবাসস্থল। জলদাপাড়ায় ৩৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৪০ প্রজাতির পাখি, ১৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৩০ প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। শাল, শিশু, খয়ের প্রভৃতি বড় জাতের উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যালুভিয়াল সাভানা প্রজাতির ঘন ঘাসজমি ছেয়ে আছে সারা অভয়ারণ্যে। প্রকৃতপক্ষে এই অভয়ারণ্যের মোট জমির ৩০ শতাংশ ঘাসজমি। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য সবুজে ছাওয়া এই অরণ্য গণ্ডারের স্বাভাবিক বাসভূমি হয়ে উঠেছে। ইতিউতি ছোটো ছোটো জলাশয় আর নলখাগড়া ঘাসের জমিতে গণ্ডারগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ও এখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণীর দেখা ভালোভাবে পেতে হলে থাকতে হবে হলং বনবাংলোয়। জলদাপাড়ার প্রবেশপথ মাদারিহাট থেকে ৭.৪ কিমি অরণ্যের গভীরে এই হলং বনবাংলো। ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা এই বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে গেছে এক সুন্দর ঝোরা। তার ওপারে বিস্তীর্ণ এক খোলা ঘাসজমিতে নুন ফেলে বানানো হয়েছে কৃত্রিম সল্টপিট বা নুনি। ভোরবেলা আর বিকেলে বন্যপ্রাণীরা সেই নুন খেতে আসে। ফলে বাংলোর লাউঞ্জ থেকে কিংবা ঝোরার ধারে বাঁধানো জায়গায় বসে এত কাছ থেকে বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়াই হলং-এর অনন্য আকর্ষণ। সারা বছরই তাই হলং-এ যথেষ্ট ভিড় থাকে। বাংলোয় একতলা-দোতলা মিলিয়ে মোট আটটি ঘর (দ্বিশয্যা)। যার মধ্যে দুটি ভি আই পি বা বন বিভাগের আধিকারিকদের জন্য সবসময়ই সংরক্ষিত থাকে। বাকি ছটির তিনটি কলকাতা থেকে ও তিনটি শিলিগুড়ি থেকে সংরক্ষণ করা যায়। তবে হলং বনবাংলোয় সংরক্ষণ না পেলেও বন ও বন্যপ্রাণী দেখা আটকাবে না। সে ক্ষেত্রে থাকতে হবে অভয়ারণ্যের বাইরে মাদারিহাটে, জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে। মাদারিহাটে অভয়ারণ্যের অফিস, চিতাবাঘ পালন কেন্দ্র ও মিউজিয়াম তথা নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। অরণ্য ও অরণ্যবাসীর সঙ্গে এগুলির দর্শনও চিত্তাকর্ষক।

জলদাপাড়ায় বন ও বন্যপ্রাণী দেখানোর দুটি ব্যবস্থা আছে। প্রথমটি হল 'এলিফ্যান্ট রাইড' আর দ্বিতীয়টি হল 'কার সাফারি'। 'এলিফ্যান্ট রাইড' অর্থাৎ হাতির পিঠে চড়িয়ে ঘোরানোর ব্যবস্থা হয় হলং বনবাংলোর সামনে 'এলিফ্যান্ট রাইডিং পয়েন্ট' থেকে। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত দুটি ট্রিপ আর ভ্রমণার্থীর সংখ্যা বেশি হলে বাড়তি আরও একটি ট্রিপের ব্যবস্থা হয়। প্রতি ট্রিপে ৪-৫টি বড় হাতি ও সঙ্গে ২-৩টি বাচ্চা হাতি যায়। এই বাচ্চা হাতিগুলি ও তাদের খেলা 'এলিফ্যান্ট রাইড' বাড়তি আনন্দ দেয়। প্রতি হাতিতে মাহুত ছাড়া ৪ জনের বসার ব্যবস্থা থাকে। প্রথম ট্রিপটি প্রধানত হলং বাংলোয় থাকা পর্যটকদের জন্য। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ট্রিপটি মাদারিহাটের ট্যুরিস্ট লজে থাকা পর্যটকদের জন্য। তাঁরা সকালে মাদারিহাট থেকে গাড়ি করে হলং বাংলোয় চলে আসেন। এইখানে বলে রাখা ভালো, যাঁরা হলং বাংলোয় বা মাদারিহাটে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে থাকবেন, এলিফ্যান্ট রাইডের সুযোগ শুধু তাঁদেরই জন্য। ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার হাতি চড়ার ব্যবস্থা করে দেন।

জলদাপাড়ায় 'কার সাফারি' অর্থাৎ গাড়িতে করে অরণ্য ঘোরার ব্যবস্থা করা হয় মাদারিহাটের ট্যুরিস্ট লজ থেকে। সকাল ৯টা ও বিকেল ৩টা এই দুটি ট্রিপের সময়। এ ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পায় ট্যুরিস্ট লজের বাসিন্দারা। এই কার সাফারিতে বনের অনেক গভীরে যাওয়া যায়। বিকেলের ট্রিপে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ বেশি। মাদারিহাট থেকে শুরু করে ২৪ কিমি পথ ঘুরে গাড়ি হলং বনবাংলোর সামনে এসে দাঁড়ায়। বিকেলে কিছুটা সময় বাংলোর সামনে

জয়ন্তী থেকে ফেরার পথে বেড়িয়ে নেওয়া যায় রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতি বীক্ষণকেন্দ্র। অরণ্য সম্পর্কিত সংগ্রহে সমৃদ্ধ এই কেন্দ্রটি সময় নিয়ে ঘুরে দেখার মতো।

সল্টপিটে বন্য প্রাণীর দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। খুব সুন্দর লাগে এই ' কার সাফারি'। মনে রাখা দরকার যে, বন্যপ্রাণীরা পর্যটকদের ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করে না। তারা আপন মর্জির মালিক। কাজেই তাদের দেখা না পাওয়াটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। মেনে নিতে হয়। তবে প্রাণী দেখা না গেলেও বন তো দেখা হবেই। সেটাও কম কিছু নয়। যদিও হাতির মাহুত বা গাড়ির চালক আপ্রাণ চেষ্টা করেন পর্যটকদের কিছু দেখানোর। বানর আর ময়ূরকে ওঁরা ঠিক বন্যপ্রাণী বলে বোধ হয় মনে করেন না। কারণ এদের হামেশাই দেখা যায়।

অভয়ারণ্য ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। অক্টোবর থেকে মে মাস এখানে আসার উপযুক্ত সময়। তবে মার্চ-এপ্রিলে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ বেশি। অরণ্যের প্রবেশদ্বার খোলা থাকে ভোর ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। 'ডে ভিজিট' পাস নিয়ে বাইরের পর্যটকরা মেন গেট থেকে হলং বাংলো পর্যন্ত গাড়ি করে ঘুরে আসতে পারেন। এর সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা। তবে বন ও বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ এতে খুব কমই আছে। অরণ্যের স্বাদও ভালোমতো পাওয়া যায় না। তবে হলং বাংলোর সামনে নুন খেতে আসা গণ্ডার বা হাতির দেখা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

অভয়ারণ্যে প্রবেশের মূল্য ভারতীয়দের জন্য মাথাপিছু ২৫ টাকা। বিদেশিদের ৫০ টাকা। হাল্কা গাড়ির প্রবেশমূল্য ৫০ টাকা। স্টিল ক্যামেরার চার্জ ২৫ টাকা, ভিডিও ক্যামেরার চার্জ ১০০০ টাকা। হাতি চড়ার মূল্য—প্রতি জন ১২০ টাকা। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ পরিচালিত 'কার সাফারি'তে ৪ সিটের গাড়ি ৫৫০ টাকা ও ছয় সিটের গাড়ি ৬০০ টাকা। সকালে মাদারিহাট ট্যুরিস্ট লজ থেকে হলং বাংলোয় যেতে খরচ মাথাপিছু ৫০ টাকা। এছাড়া অন্যান্য খরচ তো আছেই। ট্যুরিস্ট লজ থেকে পিক সিজনে পর্যটকদের জন্য গাড়িতে করে কয়েকটি কন্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা হয়। লজের ম্যানেজারই এগুলির খোঁজখবর দেবেন।

মাদারিহাট থেকে ২২ কিমি দূরের টোটোপাড়া বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ভুটান সীমান্তের কাছে তোর্সার তীরে পাহাড়ের কোলে প্রাচীন আদিবাসী গ্রাম এই টোটোপাড়া। বিশ্বের অন্যতম বিরল জনগোষ্ঠী টোটোদের বাস এখানে। নানা রোগের সংক্রমণে এঁদের সংখ্যা দ্রুতহারে কমে যাচ্ছিল। বর্তমানে সরকারের তরফ থেকে এঁদের সুস্থভাবে বাঁচার নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি ও মাদারিহাট থেকে গাড়ি যোগাযোগ আছে টোটোপাড়ার। আবার মাদারিহাট থেকে হাসিমারা হয়ে ঘুরে আসা যায় ১০ কিমি দূরের পর্যটন মানচিত্রে নতুন স্থান পাওয়া ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র বড়ডাবরি। অরণ্যের গভীর মালঙ্গী ট্যুরিস্ট লজে থাকা যায় গণ্ডার দেখার জন্য।

ডুয়ার্সে জলদাপাড়া ছাড়াও আরও দুটি আকর্ষক অভয়ারণ্য আছে। গরুমারা ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। তবে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে যাওয়ার আগে স্বাদ বদল করা যাক একটু পাহাড়ে চড়ে।

> মাদারিহাট থেকে ২২ কিমি দূরের টোটোপাড়া বেড়িয়ে নেওয়া যায়। ভুটান সীমান্তের কাছে তোর্সার তীরে পাহাড়ের কোলে প্রাচীন আদিবাসী গ্রাম এই টোটোপাড়া। বিশ্বের অন্যতম বিরল জনগোষ্ঠী টোটোদের বাস এখানে।

ঝালং ও বিন্দু

মাদারিহাট থেকে বীরপাড়া হয়ে জাতীয় সড়ক ৩১ সি ধরে এগোলে প্রায় ৬০ কিমি দূরে খুনিয়া মোড়। খুনিয়া থেকে ঘন অরণ্যের বুক চিরে আর পাহাড়ের কোলে কোলে এক আশ্চর্য সুন্দর পথের শেষে ৩৫ কিমি দূরে ঝালং অবস্থিত। পথের দুধারে সিঙ্কোনা, ইপিকাক, সর্পগন্ধার চাষ হচ্ছে। গৈরিবাসে রয়েছে এইসব ভেষজ উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরির কারখানা। সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী। নদীর ওপারে ভুটান পাহাড়, মাথায় তার ভুটানি গ্রাম। নদীরই তীরে পিকচার পোস্টকার্ডের মতো সুন্দর এক ছোট্ট জনপদ। জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি এই ঝালং-এ অবস্থিত।

ঝালং-এ প্রবেশের মুখে পুলিশ চেকপোস্ট। একটু এগোলে বাঁদিকে দেখা যায় পাহাড়ি এক ঝোরা। নাম তার ঝোলুং। তার প্রায় বুকের ওপরই ঝালং বনবাংলো। বাংলোর চারিদিকে রং-বেরং-এর ফুলের মেলা। সুন্দর সাজানো এই বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঝোলুং নদী একটু এগিয়ে বিলীন হয়েছে জলঢাকার বুকে।

বনবাংলো থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে ঝোলুং-এর সেতু পেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে এগোলে পৌঁছে যাওয়া যায় ঝালং বাজারে। ছোট জায়গায় সুন্দর ছোট বাজার। দোকানপাট কিছু আছে। চাইনিজ ফুডও পাওয়া যায়। বুধবারে হাট বসে এখানে। বাজারের একটু আগে মনাস্ট্রি ও মন্দির পড়বে। নিচের দিকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মীদের কোয়ার্টার। ছবির মতো সাজানো এই ছোট্ট জনপদে পাওয়া যায় শুধু শান্তি, নির্জনতা আর চোখের আরাম।

ঝালং বাজারের পাশ দিয়েই পাহাড় পেঁচিয়ে রাস্তা উঠেছে বিন্দুর। মধ্যবর্তী প্যারেন পর্যন্ত চড়াই, তারপর শুধু উতরাই। প্যারেনে কিছু কমলালেবুর বাগান আছে। প্যারেন থেকে বাঁদিকে চড়াই পথ চলে গেছে তোদক আর তোদে গ্রামে। এই দুটিই সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল। ঝালং থেকে ১৩ কিমি দূরের বিন্দুতে বাঁধা পড়েছে জলঢাকা। তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিন্দুতেই রাস্তা শেষ, এমনকী ভারতেরও শেষ। জলঢাকা ব্যারেজের ওপরে অন্য দেশ—ভুটান। ঘন নীল রঙের উর্দি পরা ভুটানি পুলিশ থাকে রয়্যাল ভুটান পুলিশ চৌকির সামনে। হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে ভুটান ঘুরে আসার আমন্ত্রণ জানায়। না, বিদেশ ভ্রমণের কোনও বিধিনিষেধ এখানে নেই। পায়ে পায়ে বিদেশ ভ্রমণের এই সুযোগ সবাই নেয়। ব্যারেজের ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে ৬ কিমি দূরের ভুটানি গ্রাম তেন্ডুতে। ব্যারেজের বিশাল জলাধার ও তার পাশের ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকলে, বোঝা যায় না সময় কখন কেটে গেছে। প্রতি বৃহস্পতিবার বিন্দুতে বেশ বড় হাট বসে। ভুটানিরা অনেক দূরের গ্রাম থেকে কেনাকাটা করতে আসে। বিকেলবেলায় ফিরতে থাকা অনেক ক্রেতাই সেদিন আর বাড়ি পৌঁছতে পারেন না। রাত কাটাতে হয় পথমাঝে।

আবার অরণ্য—চাপড়ামারি

ঝালং থেকে খুনিয়া মোড় আসার পথে খুনিয়ার ৪ কিমি আগে ডানদিকে পড়ে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের পথ। কুমাই থেকে খুনিয়া মোড় পর্যন্ত সমস্ত পথটাই ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু চাপড়ামারির পথে প্রবেশ করা মাত্র শিহরণ খেলে যায় শরীরে। এই গভীর গহন অরণ্যের আদিমতার সঙ্গে অন্য অরণ্যের তুলনা টানা নিষ্ফল। শুরুতেই চোখে পড়ে পথনির্দেশের বোর্ডটি দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে রয়েছে। কোনো এক সময়ে হাতির দল সভ্যতার চিহ্নকে এভাবেই অগ্রাহ্য করেছে। পথে হাতির পায়ের ছাপ গা ছমছমে ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

পাকা রাস্তা থেকে অরণ্যপথে ৪ কিমি ভিতরে চাপড়ামারি বনবাংলো ও ওয়াচ টাওয়ার। বাংলোর সামনে জলাশয়। কিছুটা খোলাজমিতে নুনমেশানো মাটি রয়েছে। এই নুনের সন্ধানে বন্যপ্রাণীরা বাংলোর সামনে চলে আসে। পিছনদিকে জঙ্গল আরও গভীর হয়েছে। চাপড়ামারি অরণ্যের গভীরতা এতই বেশি যে সূর্যালোকের অভাবে বেশিরভাগ স্থানই আর্দ্র, বিশাল বিশাল মহীরুহের গায়ে জমে থাকা শ্যাওলা এই অরণ্যের আদিমতার নিদর্শন।

গণ্ডার না থাকলেও এই অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ হাতি, ভারতীয় বাইসন, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, বন্য শূকর প্রভৃতি বন্যপ্রাণী। রয়েছে চেনা-অচেনা অজস্র পাখি। তাদের মধ্যে ধনেশ, ময়ূর, বনমুরগি বেশি চোখে পড়ে।

চাপড়ামারির আর এক আকর্ষণ তার আরণ্যক নির্জনতা। বনবাংলোয় থাকতে পারলে সেই নির্জনতা উপভোগ করা যায়। আর বাংলোর সামনে জলাশয়ের ধারে দেখা যায় নানা বন্যপ্রাণী। বুনো হাতি যখন তখনই চলে আসে বাংলোর সামনে। হাতির হামলা থেকে বাঁচার জন্য বাংলোর চারিদিকে পরিখা কাটা আছে। বিদ্যুৎবাহী তার দিয়েও বাংলোর চারিদিক ঘেরা আছে। বাংলো লাগোয়া ওয়াচ টাওয়ার থেকেও বন্যপ্রাণী দেখা যায়। তবে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য ঘোরা উচিত হবে গরুমারা অভয়ারণ্যর সঙ্গে, একযাত্রায়। কারণ চাপড়ামারিতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায় লাটাগুড়ি থেকে, যা গরুমারার কাছেই। সঙ্গে দেখা যাবে ডুয়ার্সের আর এক রত্ন, পর্যটকদের নবতম আকর্ষণ—মূর্তি।

মূর্তি

খুনিয়া মোড় থেকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁ দিকে একটি সরু পাকা রাস্তা চলে গেছে ১০ কিমি দূরের মূর্তি অভিমুখে। জলঢাকার শাখানদী মূর্তির পাড়ে বনবাংলো। নদী এখানে যথেষ্ট চওড়া। স্বচ্ছ জলস্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। জল গভীর না হলেও স্রোত তীব্র। মূর্তি বনবাংলোর পাশেই একটি কুমির প্রজনন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এখান থেকে একটু দূরে মূর্তি ও ইনডং নদীর সংগমস্থল।

সুন্দর সাজানো বাগানের মধ্যে মূর্তি বনবাংলো। দোতলা বাংলোর ওপরতলা থেকে চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। নদীর ওপারে জঙ্গল। তারও ওপাশে পাহাড়। আসলে গরুমারা অভয়ারণ্যেরই সম্প্রসারিত এই অংশে মূর্তি বনবাংলো। ফলে এখানে থাকলে অরণ্যবাসের কিছুটা স্বাদ তো পাওয়াই যায়। বাংলোর পাশে একটু উঁচু জায়গায় ওয়াচ টাওয়ার। বাংলোর চারিদিক বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘেরা। কারণ হাতির দল হামেশাই এদিকে চলে আসে। ফলে অরণ্যের বাইরে হলেও ঘোরাফেরা যথেষ্ট সাবধানে করতে হয়।

একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে গাইড হিসাবে নিয়ে মূর্তির চারপাশ ঘুরে বেড়ালে সুন্দর লাগবে। নদীতে স্নানও করা যায়। এককথায়, না দেখলে বোঝা যাবে না মূর্তি কেমন। আর দেখলে বোঝা যায় গরুমারা অভয়ারণ্য কেমন হতে পারে।

গরুমারা অভয়ারণ্য

ডুয়ার্সে জলদাপাড়া ছাড়া একমাত্র গরুমারা জাতীয় উদ্যানই গণ্ডার আর হাতির বিচরণ ক্ষেত্র। সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় বাইসন বা গউর। সুতরাং বর্তমানে গরুমারার আকর্ষণ কোনো অংশেই জলদাপাড়ার তুলনায় কম নয়। শুধু আভিজাত্যে জলদাপাড়া এগিয়ে।

১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্যের শিরোপা পাওয়া এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে যেতে হবে মূর্তি থেকে ১৮ কিমি দূরের লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ির বনদপ্তর থেকে পাওয়া যায় গরুমারা, চাপড়ামারি, চুকচুকি ও খুনিয়া ফরেস্টে প্রবেশের 'ডে-ভিজিট' পাশ। চার শিফটে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করা যায়। ভোর ৬টা থেকে ৮টা, সকাল ৮টা থেকে ১০টা, দুপুর ২টা থেকে ৪টা এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। ভোর ৫টায় সকালের শিফটের পাশ ও বেলা ১টায় দুপুরের শিফটের পাশ দেওয়া হয়। প্রতি শিফটে মাত্র ২৫ জনকে অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। সুতরাং ভিড় এড়াতে ভোর ভোর লাটাগুড়িতে আসতে হবে। লাটাগুড়িতে থাকার জন্য কয়েকটি প্রাইভেট হোটেল আছে। লাটাগুড়িতেই রয়েছে বনবিভাগের প্রকৃতি পরিচিতি কেন্দ্র। ডুয়ার্সের অরণ্য সংক্রান্ত আর একটি সুন্দর মিউজিয়ম। পাশ এখান থেকেই দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ছাড়া খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ১০টা থেকে ১১টা বন্ধ থাকে। মাথাপিছু ২৫ টাকার বিনিময়ে পাশ মেলে। গাড়ির জন্য লাগে ৫০ টাকা আর গাইড চার্জ ৪০ টাকা। প্রতি গাড়িতে একজন গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। অরণ্য বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। এছাড়া গরুমারা জাতীয় উদ্যান ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষার জন্য বন্ধ থাকে। চাপড়ামারি অরণ্যে প্রবেশের নিয়মকানুন একইরকম।

লাটাগুড়ি থেকে চালসামুখী পথ থেকে ডানদিকে বেঁকে গেছে অভয়ারণ্যে প্রবেশের পথ। মোড় থেকে

চাপড়ামারির পথে প্রবেশ করা মাত্র শিহরণ খেলে যায় শরীরে। এই গভীর গহন অরণ্যের আদিমতার সঙ্গে অন্য অরণ্যের তুলনা টানা নিষ্ফল।

৪ কিমি দূরে বনবাংলো পৌঁছতেই গভীর অরণ্য শুরু হয়ে যায়। দুধারে নজর রাখতে হবে কারণ এই পথটিতেও গণ্ডার, গউর প্রভৃতি দেখা যেতে পারে। 'ডেভিজিট' পাশ শুধু অরণ্য প্রবেশের অনুমতি। বনবাংলোয় থাকার সংরক্ষণ অন্য জায়গা থেকে হয় এবং সেটি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তাই গরুমারা-চাপড়ামারিতে ডে-ভিজিটরের সংখ্যাই বেশি।

বনবাংলো থেকে ২ কিমি দূরে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার। এই পথে সবুজ বিশাল মহীরুহের ভিড় আঁধার করে রাখে চারিদিক। ওয়াচ টাওয়ারের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। ওপাশে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেখানে নুন ছড়ানো। তাই ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখা পাওয়া যায় গণ্ডার, হাতির দল, বন্য শূকর, গউর, হরিণের। তবে পর্যটকদের ভিড়ে বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ কিছুটা ব্যাহত হয়। গরুমারার বন্যপ্রাণী দেখার আদর্শ স্থান হল গরাতি ওয়াচ টাওয়ার। যেখানে যেতে হলে বনবিভাগের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন।

যাঁরা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনবাংলোয় থাকার সুযোগ পাবেন সেই রাতটি হবে তাঁদের জীবনের অন্যতম সুন্দর স্মরণীয় রাত। অনন্য অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবে গরুমারা বনবাংলো। বাগান দিয়ে ঘেরা দোতলা এই বনবাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে ঘোলা জলের ইনডং নদী। ইনডং-এর ওপারে কৃত্রিমভাবে তৈরি সল্টপিট ও তারও পরে গহন সবুজ অরণ্য। ৮০ বর্গকিমির এই অরণ্যে শাল, সেগুন, শিশু, জারুল, শিরীষ গাছের ভিড়। বাংলোর অদূরে ওয়াচ টাওয়ারটি যেন পাহাড় থেকে ঝুলছে। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে রাতে স্পট লাইটের সাহায্যে বন্যপ্রাণীর গতিবিধি দেখতে পাওয়া যায়।

ডুয়ার্সের তিন অভয়ারণ্য দেখার পর আর কিছু দেখার ইচ্ছা না থাকতেই পারে। কিন্তু সবুজ বনভূমি থেকে নীল পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়লে সামসিং যাওয়ার ইচ্ছেটা একটু একটু করে বাড়তে থাকবে।

যাঁরা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বনবাংলোয় থাকার সুযোগ পাবেন সেই রাতটি হবে তাঁদের জীবনের অন্যতম সুন্দর স্মরণীয় রাত। অনন্য অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবে গরুমারা বনবাংলো।

সামসিং

গরুমারা থেকে ১৪ কিমি দূরে জাতীয় সড়কের ওপর চারমাথার মোড়, চালসা। চালসা থেকে উত্তরের দিকে ১৮ কিমি দূরে পাহাড়ের মাথায় এক ছোট্ট জনপদ সামসিং। চা বাগান আর চা বাগান। সামসিং-এর পথে শুধুই চা বাগান। জঙ্গল এখানে পাহাড়কে পথ ছেড়ে দিয়েছে। সেই পাহাড়ের ঢালে ঢালে ইনডং থার্বো, আইভিল, চালসা, সামসিং এমন সব সুন্দর নামের চা বাগানের ঢেউ খেলে যায়।

চালসা থেকে কয়েকটি বাঁক খেয়ে রাস্তাটি উঠে এসেছে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায়। গড়ে উঠেছে উচ্চবিত্তদের জন্য সিনক্লেয়ার্স রিসর্ট। এখান থেকে ডুয়ার্সের সমতল চোখে পড়ে। ৮ কিমি দূরের মেটেলি দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মন্দির, বাজার নিয়ে বেশ জমজমাট। একটু নিচে সামসিং বাজারকে রেখে ফাঁকা রাস্তাটি বনবিভাগের ছড়ানো ছিটোনো ঘরবাড়ি, বিস্তর কাঠের গুঁড়ি আর বিশাল বিশাল গাছের ফাঁক দিয়ে উঠে গেছে বনবাংলোর দিকে।

সামসিং-এর একতলা বনবাংলোটি খুব সুন্দর, দেখলেই পছন্দ হয়ে যায়। চারধারে নানা ফুলের গাছ। বাংলোর চারিদিক তারের জাল দিয়ে ঘেরা। দূরে চোখে পড়ে সবুজ পাহাড়। অনেক নিচ দিয়ে বয়ে চলা মূর্তি নদী চোখে ধরা না পড়লেও কানে তার আওয়াজ শুনিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। চির নির্জনতার এক দেশ যেন সামসিং।

নেওরাভ্যালির এক প্রান্ত হল সামসিং। এখান থেকে ট্রেকিং করে যাওয়া যায় লাভা। বনবাংলো থেকে একটু আগে পাথরে বাঁধানো একটি রাস্তা কয়েকটি বাড়িঘরের পাশ দিয়ে কমলালেবু বাগানের ছায়ায় ছায়ায় নিচের দিকে নেমে গেছে। চোখে পড়ে অনেক নিচে মূর্তি নদী। প্রকৃতির নিজস্ব এক ভিউ পয়েন্ট। এই রাস্তায় আড়াই কিমি নিচে মূর্তির বুকে বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড ছড়ানো, সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে পথ করে সগর্জনে বয়ে চলেছে মূর্তি। কোথাও কোথাও ছোট-খাটো জলপ্রপাতের রূপ নিয়েছে নদী। নামকরণটিও সার্থক—রকি আইল্যান্ড। এখানে রয়েছে এক প্রাইভেট হোটেল। থাকার ব্যবস্থা মূর্তির তীরে তাঁবুতে। দু-এক দিনের সুন্দর অবকাশ যাপনের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে রকি আইল্যান্ডকে।

সামসিং-এর আর এক আকর্ষণ সুনতালেখোলা ৪ কিমি দূরে। বনবাংলোর সামনের রাস্তাটি ধরে এগোলে ২ কিমি পর আসে ছোট গ্রাম ভারিয়া। সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ি আর লাগোয়া ফুলের বাগান। পথে যেতে চোখে পড়ে অজস্র রঙ বেরঙের প্রজাতি। রাস্তার শেষ সুনতালেখোলায়। ছোট পাহাড়ি ঝোরা সুনতালেখোলার ওপর ঝোলা পুল পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের প্রকৃতি দর্শন কেন্দ্র। এই রাস্তাটি হেঁটে এলে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করা যায়। চূড়ান্ত নির্জন সুনতালেখোলায় সঙ্গী শুধু পাহাড়ি ঝোরার সুর, সবুজ পাহাড়, পাখির কাকলি আর প্রজাতির ওড়াউড়ি। থাকার জন্য রয়েছে সুনতালেখোলা ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্পের সুদৃশ্য কটেজ।

সামসিং পাহাড় থেকে নেমে চালসা মোড় থেকে গাড়ি, বাস পাওয়া যায় শিলিগুড়ি আসার জন্য। অথবা চালসা রেলস্টেশন থেকে ট্রেনেও শিলিগুড়ি আসা যায়। রোমাঞ্চকর রেলযাত্রার অভিজ্ঞতা হবে এতে। আবার চালসা মোড় থেকে ৮ কিমি শিলিগুড়ি অভিমুখে এসে মালবাজারে একদিন কাটানো যায়। থাকার জন্য রয়েছে মালবাজার ট্যুরিস্ট লজ। লজের গা-ঘেঁসে চা বাগান শুরু হয়েছে। বনদপ্তর 'মাল উদ্যান' নামে সুন্দর একটি ফুলের বাগান গড়ে তুলেছে ট্যুরিস্ট লজের কাছে। ব্যস্ততা থাকলেও শান্তশ্রী আছে মালবাজারে। ট্যুরিস্ট লজের ছাদ থেকে দেখা যায় চা বাগানে মহিলাদের চা তোলা, হালকা জঙ্গল আর অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখি। কাছেই রয়েছে

ছবির মতো সুন্দর ছোট রেলস্টেশন নিউ মাল জংশন। এখান থেকে ট্রেনে বা মালবাজার থেকে গাড়িতে, বাসে ফেরা যায় উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম শহর শিলিগুড়িতে।

ডুয়ার্স ভ্রমণের উপযুক্ত সময় অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। অন্য সময়ও আসা যায়। ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বন্য প্রকৃতি কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। এখানে দেখার কত জায়গা, নাম করেও শেষ করা যায় না। তাই একবার ডুয়ার্স দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবনা আসে মনে, এত রূপ কিন্তু কেউ দেখল না, কেউ জানল না। তাই ফিরে আসতে হয় বারেবারে। নতুন সঙ্গীদের নিয়ে। আসলে ডুয়ার্স হল প্রকৃতির বুকে গড়ে ওঠা সেই স্বর্গ, যার ঠিকানা মানুষ সারা জীবন ধরে খুঁজে ফেরে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

ডুয়ার্সকে ভালভাবে ঘোরার জন্য দুটি সার্কিট করা যায়। প্রথমটিতে কোচবিহার, জয়ন্তী, বক্সা, রাজাভাতখাওয়া ও জলদাপাড়া। শুরু কোচবিহার দিয়ে ও শেষ শিলিগুড়ি অথবা ফালাকাটায়। দ্বিতীয়টিতে মালবাজার অথবা লাটাগুড়িকে কেন্দ্র করে গরুমারা, মূর্তি, চাপড়ামারি, ঝালং, বিন্দু ও সামসিং। শুরু ও শেষ শিলিগুড়ি দিয়ে।

যাওয়া ট্রেনে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে অটো বা রিকশায় শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে ডুয়ার্সের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য বাস ছাড়ে। গাড়িও পাওয়া যায়। সি এস টি সি-র বাস যাচ্ছে শিলিগুড়ি, মালবাজার ও কোচবিহারে। তিস্তা তোর্সা, কামরূপ ও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে পৌঁছে যাওয়া যায় নিউ কোচবিহার। বর্তমানে শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি জংশন, নিউ মাল জংশন হয়ে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত যাচ্ছে। অক্টোবর, ২০০৪ থেকে ট্রেনগুলির সময় পরিবর্তন হয়ে গেছে। আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে বা গাড়িতে ২৪ কিমি দূরের কোচবিহারে যাওয়া যায়।

গাড়িভাড়া শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার—৫০০/৬০০ টাকা।

মালবাজার থেকে গরুমারা মূর্তি-সামসিং-সুনতালেখোলা—৮০০/১০০০ টাকা।

মালবাজার থেকে ঝালং-বিন্দু-চাপড়ামারি—১০০০/১২০০ টাকা

মালবাজার থেকে মাদারিহাট-হলং-১২০০ টাকা (করাতের জন্য গাড়ির হল্টিং চার্জ—৩০০ টাকা) মাদারিহাট থেকে হলং বনবাংলো—৩০০ টাকা

কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তী, বক্সা, বড়ডাবরি ও মাদারিহাট বা হলং-এর জন্য গাড়ি দরদাম করে নিতে হবে। বর্তমানে দিনপ্রতি ১০০০/১২০০ টাকা বা কিমি প্রতি ৫/৬ টাকা ভাড়া চলছে। আলিপুরদুয়ার থেকে সকাল ৭টায় ও দুপুর ২টায় জয়ন্তীর বাস পাওয়া যায়।

থাকা

হলং বনবাংলো মাদারিহাটের জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ ও মালবাজার ট্যুরিস্ট লজের অগ্রিম সংরক্ষণ হয়

ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২, বিবাদী বাগ (পূর্ব) কলি-১ ফোন ২২১০৩১৯৯, ২২৪৮৪২৭১

মালবাজার ট্যুরিস্ট লজ, পোঃ মাল, জেলা জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬২) ২৫৫১৮৩-এ সরাসরি সংরক্ষণ করা যায়।

হলং বনবাংলোর তিনটি ঘরের সংরক্ষণ শিলিগুড়ি থেকে হয়। ঠিকানা ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, ফোন (০৩৫৬৩) ৫১১৯৭৪, ৫১১৯৭৯

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ, মাদারিহাট, ফোন (০৩৫৬৩) ৬২২৩০-এ সরাসরি সংরক্ষণ হয়।

রসিকবিল, বড়ডাবরি, মূর্তি সামসিং, সুনতালেখোলা ও ঝালং বনবাংলোর সংরক্ষণ কলকাতা থেকে হয়। ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার (সপ্তম তল), কলি-১৩, ফোন ২২৩৭০০৬০, ২২৩৭০০৬১

ঝালং বাজারে কয়েকটি প্রাইভেট হোটেল আছে। বিন্দুতেও আছে একটি হোটেল।

মূর্তিতে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে মূর্তি রিভার ক্যাম্প। সংরক্ষণের ঠিকানা : এনজয় ট্রাভেলস, ১, এন এস রোড (তিনতলা), কলি-১, ফোন ২২১০০৪৭২

গরুমারা ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের বনবাংলো সংরক্ষণের ঠিকানা বিভাগীয় বনাধিকারিক বা ডি এফ ও, বন্যপ্রাণী শাখা (২), অরণ্য ভবন, জলপাইগুড়ি ফোন (০৩৫৬১) ২৪৯০৭।

জয়ন্তী, বক্সা ও রাজাভাতখাওয়ার বনবাংলো সংরক্ষণের ঠিকানা ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট), আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ফোন (০৩৫৬৪) ৫৫১২৯।

জয়ন্তীর জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাংলো সংরক্ষণের ঠিকানা নির্বাহী আধিকারিক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬১) ৩০৬৫৯।

কোচবিহার শহরে মাঝারিমানের বেশ কয়েকটি প্রাইভেট হোটেল আছে। এছাড়া আছে জেলা পরিষদের অতিথি নিবাস, ফোন (০৩৫৮২) ২২৪২৯/২২৫২৭ এবং পৌর কর্তৃপক্ষের পান্থনিবাস, ফোন (০৩৫৮২) ২২৬৬৮

চালসায় পূর্ত বিভাগের দুটি বাংলো সংরক্ষণের ঠিকানা নির্বাহী আধিকারিক, নাগরাকাটা নির্মাণ বিভাগ (পূর্ত বিভাগ), পোঃ মাল, জলপাইগুড়ি, ফোন (০৩৫৬২) ৫৫১২৯।

থাকার ভাড়া ও খাওয়ার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অতিথিনিবাস সংরক্ষণের সময় জেনে নিতে হবে।

একবার ডুয়ার্স দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবনা আসে মনে, এত রূপ কিন্তু কেউ দেখল না, কেউ জানল না। তাই ফিরে আসতে হয় বারেবারে। নতুন সঙ্গীদের নিয়ে।

হাত বাড়ালেই হিজুলি সংরক্ষিত অরণ্য

সোমা পাল

কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে বহরমপুর যাওয়ার পথে যে ছোট্টো নদীটির সেতু প্রথম পার হতে হয় নাম তার চূর্ণি। রানাঘাট ছাড়াতেই রেললাইনের ধার বরাবর প্রায় হাত ধরাধরি করে চলতে থাকা পায়ে চলা সুঁড়ি পথ যেখানে শেষ হয় তারই কাছাকাছি আমাদের সেই ছোটো নদী চূর্ণি। আর আরও কাছে হিজুলি সংরক্ষিত অরণ্য। স্থানীয় মানুষেরা যাকে গুমা ফরেস্ট বা নতুন গ্রাম ফরেস্ট নামে চেনে।

কলকাতা থেকে মাত্র ৭৫ কিলোমিটার দূরে সবুজ অরণ্যে ঘেরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাঁরা একটা দিন কিংবা দুটো দিনের নিশ্চিন্ত অবসর কাটাতে চান তাঁদের পক্ষে জায়গাটি নিঃসন্দেহে আদর্শ স্থান। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাটগামী যে কোনো ট্রেনে পৌঁছানো যায় রানাঘাট স্টেশনে। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে ভ্যানরিক্সা বা রিক্সায় চেপে নতুন গ্রাম ফরেস্ট বললেই ওঁরাই পৌঁছে দেবেন গন্তব্যস্থানে। তবে ব্যক্তিগত গাড়িতে করেও যাওয়া যেতে পারে ফরেস্টে। নদিয়া জেলার বনদপ্তরের অধীন অন্যতম রানাঘাট রেঞ্জের এই ফরেস্টটি ৩৩.৭২ হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে। প্রায় পুরো জায়গাটাই পায়ে পায়ে বেড়িয়ে নেওয়া যায়। শিশু, সেগুন, মেহগনি, চাপ, আকাশমণি, অর্জুন, সাল প্রভৃতি গাছের সঙ্গে নিভৃতে আলাপচারিতায় কেটে যেতে পারে পুরো একটা দিন। বন্যজন্তু নয়—এখানে খুঁজে পাওয়া যায় শেয়াল, সাপ, ভাম। কিংবা জঙ্গলের পথ চলতে চলতে হঠাৎ-ই লাফ দিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ায় হনুমানের দল। ওদের চেঁচামিচি আর দাঁত খিঁচুনি দেখে পড়িমরি করে রাস্তা বদলাতে হয়। ফিরে আসে শৈশব—মজাও লাগে বেশ। কাঁটাতারের বেড়ার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ-ই থমকে দাঁড়াতে হয় এক নার্সারির সামনে এসে। এই তো সেই শিশু উদ্ভিদের সূতিকাগৃহ, যেখানে পরম যত্নে লালিত-পালিত হচ্ছে আগামি দিনের মহীরুহ। শিশুর ক্ষতির আশঙ্কায় যেমন সূতিকাগৃহে ঢোকা নিষিদ্ধ সকলের, তেমনই আগামি দিনের ভাবী বনস্পতির জন্য আবাসনটিও সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত নয়। বিট অফিসার জানান যে শুধু হিজুলি সংরক্ষিত অরণ্য নয়, রানাঘাট রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে খিসমা ফরেস্ট, ধানতলার শংকরপুর ফরেস্ট, গাংনাপুর ফরেস্ট। এরমধ্যে খিসমা ফরেস্টে রয়েছে মনোরম বেতগাছের ঘন জঙ্গল। তবে এর কোনোটাতেই বনদপ্তরের রেস্ট হাউস নেই। সেদিক থেকে হিজুলি ফরেস্টেই রয়েছে একমাত্র বনবাংলো। এখানে দুটি ডাবল বেডরুমের প্রতিটির ভাড়া ১৭৫ টাকা করে। যাঁরা এখানে থাকতে চান তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে ডি এফ ও কৃষ্ণনগর, জেলা নদিয়া, ফোন নং-(৯৫৩৪৭২)-২৫২৩৬২। আর সরাসরি রেঞ্জ অফিসার হিজুলি সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে ফোন করাও যেতে পারে। ফোন নং-(৯৫৩৪৭৩)-২৮৩১২৬।

শহুরে জীবনের যাবতীয় সুখ সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বাংলোটি। হ্যালোজেন আলোর পথ পেরিয়ে লোহার বড়ো গোল গেটের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়বে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, পপি আর নানা মরশুমি ফুলে ছাওয়া কেয়ারি করা বাগান। তারই মাঝে সিমেন্ট বাঁধানো পথ উঠে গেছে বনবাংলোর সাজানো বারান্দায়। একটু খেয়াল করলেই নজরে পড়বে ছাঁটা ঘাসে ইংরাজি ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা হিজুলি ফরেস্ট। বারান্দায় কাঁচের জানালায় দড়িটানা ফোল্ডিং খসখস ঝুলছে গরমের তাপ থেকে বাঁচার জন্য। রয়েছে গদিমোড়া আরামদায়ক সোফা আর তার সামনে কাঁচের সেন্টার টেবিল। দুটি ঘরের মধ্যবর্তী এই সাজানো-গোছানো বারান্দা পেরোলেই ডাইনিং হল। ছজনের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও আছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ফিল্টার এবং একটি রেফ্রিজারেটর। পর্যটকদের রান্নার ব্যবস্থা ও দেখভালের দায়িত্বে আছেন প্রভাত চৌধুরী, নারায়ণ বিশ্বাস। ফরেস্টের কাছেই রথতলা বাজার। ইচ্ছা করলে নিজেরা বাজার-হাট করে দিতে পারেন এঁদেরকে; রান্নার ব্যবস্থা এঁরাই করবেন। তবে দুদিনের ছুটি উপভোগ করতে চাইলে শুধুমাত্র টাকা-পয়সা তুলে দিয়ে এঁদের হাতেই নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যায় খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা।

মিষ্টি দুটি নাম—রেইল ও কোয়েল। হিজুলি বনবাংলোয় ডাবল বেডের মাত্র এই দুটিই ঘর। ঘরসংলগ্ন বাথরুম, মাথার উপরে ঘূর্ণায়মান পাখা, বিজলি বাতি, ড্রেসিংটেবিল, লেখার টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আধুনিক জীবনযাত্রার যাবতীয় সুবিধা ছাড়াও অতিরিক্ত পাওনা অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা রেলিং ঘেরা এক ছোট্টো ব্যালকনি। এই ব্যালকনিতে চেয়ার পেতে শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে বসে সহজেই কেটে যায় সুন্দর একটা দিন। চারিপাশে শুধু গাছ আর গাছ, গাছের মাথায় মাথায় কত অজস্র পাখির কিচিরমিচির, পাতায় পাতায় জালিকাটা রোদ-ছায়ার খেলা মুগ্ধ করে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ-ই কু-ঝিক্-ঝিক্। উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে একেবারে হাতের নাগালের মধ্যেই হলুদ-সবুজ রেলগাড়ি এঁকেবেঁকে চলেছে। মুহূর্তে ঝোপঝাড়, বনবাদাড় পেরিয়ে মন দৌড়েছে অপু-দুর্গার সঙ্গে। রাতে জানলা দিয়ে চাঁদের আলোয় যখন ঘর ভেসে যাচ্ছে ঠিক তখনই এক ঝলক হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়ে মিষ্টি একটা গন্ধ। উঁহুঁ, এতো আম্রমুকুলের চেনা গন্ধ নয়। উঁকি দিয়ে দেখি জানলার পাশে এলিয়ে পড়া ছোটো এলাচের ডালটিতে বাতাস এসে দোল দিয়েছে আর তারই গন্ধে ম ম করছে কোয়েল।

হাতে একটা দিন সময় বেশি থাকলে এখান থেকে ঘুরে নেওয়া যায় পারমাদান ফরেস্ট বা বিভূতিভূষণ সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। আবার অত দূর যেতে ইচ্ছা না করলে রানাঘাটে রণডাকাতের মন্দির, কালী-নারায়ণপুরের চূর্ণির উপর নৌকায় করে বেড়ান, কিংবা বীরনগরের টেরাকোটার মন্দিরে ভাস্কর্যের সন্ধানেও কেটে যেতে পারে সুন্দর একটি দিন। এরই সঙ্গে রসনা তৃপ্তির জন্য রয়েছে রানাঘাটের বিখ্যাত পান্তুয়া। তাই ফেরবার পথের ঝুলিটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ভালো লাগায় আর নিখাদ প্রকৃতি-পরিবেশে একাত্মীভূত হয়ে যাওয়ার বাসনায়।

রথযাত্রা, অন্যরথ প্রসঙ্গ বাঁকুড়া

কান্তি হাজরা

আদিমকাল থেকে মানুষের জীবন-যাপনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মেলা ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে মেলা শব্দের মূলে মিল্ ধাতু—মিলিত হওয়া। এই ধাতু থেকেই মিলন, মেলা ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। প্রাগৈতিহাসিক কালে মিলন ছিল জৈবিক প্রয়োজনে। আদিম খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ নিষাদ জীবন অতিক্রম করে যখন পশুপালক তখন সম্ভবত তারা পশু বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিল যার ফলশ্রুতি দেশবিদেশের পশুমেলা। পশুমেলা হিসেবে এ দেশে হরিহরছত্রের খ্যাতি সুবিদিত। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে পশুমেলার অনুরূপ দাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের মেলার প্রচলন দেখা যায় যেখানে মানুষ শুধুই পণ্য—পরখ করার জন্য নিরাবরণও হতে হত। বিভিন্ন ঋতুতে নানা প্রজাতির পশুপক্ষী যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে যে সব জায়গায় মিলিত হত সেই সব স্থানে শিকারি মানুষের ভিড় মেলায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ১ মাঘের 'এখান পরব'-এর মধ্যে সেই নিষাদ জীবনের রক্তের গন্ধ এখনও অনুভব করা যায়। তবে লৌকিক, পৌরাণিক এবং আঞ্চলিক দেবদেবীদের পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করেই সর্বাধিক সংখ্যক মেলার উদ্ভব। এই সব মেলার মধ্যে আর্য-অনার্য, নিষাদ আদি অস্ট্রালয়েড, শৈবশাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল সুফি ইত্যাদি বিচিত্র ধারা উপধারা প্রবাহিত।

এদেশে লোকধর্মের নানা ব্রত কৃত্য চর্যাকে কেন্দ্র করে যেমন মেলার উদ্ভব অনুরূপভাবে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এমনকী খ্রিস্টধর্মের নানা পূজার্চনাকে অবলম্বন করেও প্রবর্তিত মেলার সংখ্যাও কম নয়। হিন্দু বৌদ্ধ যুগের পর ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে এই ধর্মের আচারকেন্দ্রিক অথবা সিদ্ধপুরুষ পীর ফকির সহজিয়া সাধকদের জন্মমৃত্যু বহু মেলার প্রবর্তনের মূলে। বিভিন্ন ধর্মকেন্দ্রিক এইসব মেলার মধ্যে রথের মেলা অনন্য—সমারোহ জনপ্রিয়তা সব দিকেই। রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। বাঙালির নানা পূজাপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানের অন্যতম এই রথযাত্রা। রথযাত্রার প্রচলন সম্ভবত বৌদ্ধরা করেছিলেন। তবে রথ শুধু জগন্নাথেরই নয়—বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণের, সূর্যের। জৈনদেরও রথযাত্রা প্রচলিত। রোম শহরে যীশুখ্রিস্টের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। উত্তর ভারতে রামচন্দ্রের রথ প্রচলিত ছিল।

বাঁকুড়ার প্রচলিত জগন্নাথ বা বিষ্ণুবাসুদেবের রথযাত্রার সমান্তরালে একটি অন্য রথযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮২০ সালের ২৫ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' এর পাতায়—'জিলা জঙ্গালমহলের শহর বাঁকুড়া হইতে পূর্বদিকে অনুমান দেড়ক্রোশ অন্তরে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে। সেখানে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিনে রঘুনাথদেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোকযাত্রা হয় এবং নানাদেশ হইতে অনেক দোকান পশারিরা গিয়া নানাপ্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে।' তপোবনের রথ যে একসময় বঙ্গাদেশে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সমাচার দর্পণ'-এ ১৮৩ বছর আগে উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। এই মেলা দশদিন চলত এবং জেলার বাইরে সুদূর কলকাতা থেকেও দোকানিরা পশরা নিয়ে আসতেন এমন জনশ্রুতি। দ্বারকেশ্বর নদীর প্রাচীন নাম ধলকিশোর (> ধবলকিশোর)। Statement of Navigable Rivers Khals and Canals of Bengal 1866-র একটি উল্লেখ থেকে জানা যায় দ্বারকেশ্বর নদে বর্ষার সময় ২০০ মন চাল নিয়ে নৌকা চলাচল করত। মেলা সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তী রয়েছে। রথযাত্রার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। ইংরেজ আমলে কোনও সময়ে তপোবন মৌজায় পত্তনিদার কুলদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পিতলের রথ তৈরি করান। দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী সোনাতপল মন্দিরের কাছাকাছি একটি হনুমান মন্দিরে একদা ছত্রধারী লক্ষ্মণ সহ রামসীতার মূর্তি ছিল বলে জানা যায়। তপোবনের মেলা এখন ক্ষুদ্র গ্রাম্যমেলা। নতুন দালান মন্দিরে পলস্তারায় খোদিত মূর্তি থেকে অনুমান করা যায় এখানে উত্তর ভারতের রামপূজকেরা প্রভাব বিস্তার করেন। অন্য বিরল রথটি 'রাবণকাটা রথ'। জয়পুর থানার চাতরা গ্রামে বিজয়া দশমীর দিনে শুরু সমাপ্তি দ্বাদশীর রাত্রে। চারটি লোহার চাকাবিশিষ্ট কুড়ি ফুট উচ্চতার কাঠের রথটি আগে চাতরা স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে কলকাতা পর্যন্ত যেতে এখন যায় স্কুলডাঙ্গা পর্যন্ত দূরত্ব ২০০ মিটার। কিংবদন্তী, মল্লভূমের নরপতি বীরসিংহের প্রথমা মহিষী চূড়ামণিদেবীর সঙ্গে পুরীতে সীতারাম দাস মোহন্ত নামে এক সাধুর দেখা হয় এবং রানি তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। পরে রানি রামসীতার যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হন এবং মোহন্তকে সেই দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ জানান। রানি জঙ্গালাকীর্ণ কৃষ্ণনগর গ্রামে মন্দির স্থাপন করে সেখানে সীতারাম দাসের তত্ত্বাবধানে রামসীতা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'চত্বর' দান করেন। অনুমান সেই চত্বর থেকে চাতরা কৃষ্ণনগর। এখানে অস্থল নির্মিত হয় যাঁর প্রথম মোহন্ত সীতারাম দাস। পরবর্তী মোহন্তরা রতন দাস, মধুসূদন দাস ইত্যাদি দশ জন মহন্ত। শেষ মহন্ত শ্রীঅযোধ্যা শরণ দেব মহন্ত। এর সময়কাল আনুমানিক ১৯০৭-১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ। সম্ভবত অস্থল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই অকাল রথের প্রচলন।

রামায়ণে বর্ণিত অকালবোধন কাহিনি সূত্রানুসারেই এই রাবণকাটা রথের অনুষ্ঠান। বিজয়ার দিনে উৎসবের সূত্রপাত—দ্বাদশীতে শেষ। একাদশীর দিনে রামের রথ চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আগে বিপরীত দিক থেকে রাবণের রথ আসত। দ্বাদশীর দিন উভয় রথ মুখোমুখি হলে যুদ্ধ বেধে যেত। সেই রথে উপবিষ্ট সাড়ে চার ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কাঠের মাথাওয়ালা টিনের তৈরি রাবণ। হিজলডিহা গ্রামের বক্সীরা লোকলস্কর বাজনা বাদ্যি নিয়ে এসে

রাবণবধের আদেশ দিত। এক সময় রাবণকাটা রথ দেখতে লোক ভেঙে পড়ত। রাইবাঘিনী গ্রামেও এই উৎসবের প্রচলন। চাতরার রাবণকাটা রথের অনুষ্ঠানে বাগদি সম্প্রদায়ের সাগর মহাদণ্ড, কমল মহাদণ্ড, শ্যামল মহাদণ্ড, অলোক মহাদণ্ড প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, ব্যান্ড ইত্যাদি যন্ত্রানুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুপুরের রাবণকাটা বা রাবণকাটা নাচও একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসমূলও অভিন্ন। মনিবর্ধন এ নাচকে সিংগিছাম্ বলেছেন। তবে এখানে হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব ইত্যাদি মুখোশ ও পোশাক ব্যবহার করে। চাতরার রাবণকাটা রথে এখন পোশাক বা মুখোশের ব্যবহার দেখা যায় না। হুগলি জেলায় গোঘাটে বিজয়ার দিন স্বরূপ নারাণের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাবণকাটা, চাতরার রাবণকাটা রথ বা তপোবনে রঘুনাথদেবের রথযাত্রা থেকে যে প্রতীতিতে উপনয়ন সম্ভব, এই অঞ্চলে রামকথা এবং রামভক্তি প্রাধান্য অর্জন করেছিল। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন কবি শংকর চক্রবর্তী, সাফল্য রাম, ধনঞ্জয়, জগদ্রাম রায়, কবি রামপ্রসাদ রামকথা অবলম্বনে বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, রামকথা, অদ্ভুত রামায়ণ, দুর্গাপঞ্চ রাত্রি রচনায় কৃতিত্ব একই অভিজ্ঞানের স্মারক।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভ্রমণ ক্যুইজ একটি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সমাজ-কল্যাণ আধিকারিক দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ১২৬৮টি প্রশ্নোত্তরের মালায় 'ভ্রমণ ক্যুইজ' নামে ১১৬ পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন। বর্তমান সময়ে ক্যুইজ খুবই জনপ্রিয়। জ্ঞানচর্চার সনাতন পথ ক্ষীয়মাণ হতে হতে এখন রীতিমতো সংকটের মুখোমুখি পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে তথ্য ও সংখ্যাভিত্তিক উত্তেজনাপ্রবণ ক্যুইজ চটজলদি জ্ঞানের স্মারক হয়ে দিকে দিকে আসর মাতাচ্ছে। এই প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত আছেন বলেই দিলীপবাবু ভ্রমণ ক্যুইজে হাত দিয়েছেন।

ভ্রমণ দেশে দেশে ও কালে কালে মানুষের পরম আকর্ষণের বিষয়। ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি-অনুষঙ্গ ও আধ্যাত্মিকতা যেমন প্রাণ পেয়েছে, ব্যক্তিক-অনুভূতি-নির্ভর সাহিত্য-প্রণোদনও সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্যবার। ভ্রমণের সাত-সতেরো জানিয়ে, পথনির্দেশ ও হাল-হকিকত-নির্ভর লেখাও সংখ্যায় কিছু কম নয়। ভ্রমণের অনুষঙ্গে দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাসের তত্ত্ব-তালাশ আর একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এইসব পদ্ধতি-প্রকরণ থেকে নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন একটি পদক্ষেপ 'ভ্রমণ-ক্যুইজ'।

বত্রিশটি অধ্যায় সাড়ে-চুয়াত্তর পাতায় ছড়ানো আছে প্রশ্নমালা। বর্ণানুক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত ২৫টি রাজ্য এবং আন্দামান-নিকোবর, পণ্ডিচেরি, দমন-দিউ ও লাক্ষাদ্বীপ—এই চার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলি সাজানো হয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লিও আছে। তবে নবগঠিত ছত্তিশগড়, উত্তরাঞ্চল ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কথা বা ওই তিন রাজ্যের ভ্রমণ অনুষঙ্গগুলি অধ্যায়গতভাবে এ বইতে আসেনি। ২০০৩-এর কলকাতা বইমেলায় বইটি প্রকাশিত। তাই দেশের ২৮টি রাজ্যের পৃথক পৃথক ভ্রমণ-পরিচয় থাকা উচিত ছিল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে চণ্ডীগড় এবং দাদরা ও নগর হাভেলির কথা এলে ভৌগোলিক বৃত্তটি পূর্ণ হত। সংলাপ ভ্রমণভূমি হিসেবে নেপাল ও ভুটানের অন্তর্ভুক্ত যথাযথ হয়েছে। চণ্ডীগড় অবশ্য পঞ্জাব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত এসেছে। নবগঠিত রাজ্যগুলির অংশবিশেষ পূর্বতন রাজ্যগুলিতে মিলিতভাবে রয়েছে।

বইটির পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সুখ্যাত ভ্রামণিক শঙ্কু মহারাজ উল্লেখ করেছেন, ইংরেজিতে ১০০০টি হিমালয়ান ক্যুইজ [বিল আইটকেন] জাতীয় বই থাকলেও বাংলা ভাষায় এমন বইয়ের অভাব ছিল। শঙ্কু মহারাজের কথার রেশ ধরে আমরা বলতে পারি, দিলীপবাবু 'ভ্রমণ ক্যুইজ' তৈরি করে অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন।

রাজ্য, দেশ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নামের আদ্যক্ষর ধরে ক্রম সাজিয়েছেন দিলীপবাবু। তাঁর প্রশ্নমালায় বেশ কিছু চমক আছে। যেমন—কোন্ দুটি যমজ শহর ভারতের বুদাপেস্ট নামে খ্যাত কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশের কোন্ অঞ্চলে স্যার রোনাল্ড রসের একটি বাড়ি আছে প্রভৃতি। ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম স্কি-রিসর্টটি যে আউলিতে, গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর, গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ হাঁটাপথে ১৯ কিমি, সতীর নাভি পড়েছে বলে ওড়িশার যাজপুর হিন্দু তীর্থক্ষেত্র, গোয়ার সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চের ভেতরের থামগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আছে এবং এই গির্জার দশটি ঘণ্টার অন্যতম বৃহৎ স্বর্ণঘণ্টাটি বাজালে দশ কিমি দূর পর্যন্ত শোনা যায়—এমন সব মজাদার তথ্য বইটি পড়লে জানা যায়।

ভ্রমণ ক্যুইজে ইতিহাস, পুরাণ ও ভূগোলের নানা প্রশ্ন সুনির্দিষ্টভাবে আছে। শকুনির সাহায্য ও পরামর্শে দুর্যোধন একটা ভঙ্গুর মাচা তৈরি করিয়ে সেই মাচার উপর শ্রীকৃষ্ণকে বসিয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কৃষ্ণ বিশেষ এক ভঙ্গিতে বিশ্বরূপ ধরেছিলেন। কৃষ্ণের সেই মূর্তিটি যে কাঞ্চীপুরমে পাণ্ডবদূত পেরুমল মন্দিরে আছে, তা দিলীপবাবু জানিয়েছেন। কুতুবউদ্দিন আইবকের বিজয়স্তম্ভের নাম, ময়ূর সিংহাসন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধিসৌধ, অর্জুন-উলুপীর বিবাহস্থান (পৌরাণিক ইতিহাস), পাঞ্জাবি পুরুষদের পাঁচটি ধারণীয় বস্তু, পিঞ্জোর গার্ডেনের স্থপতি ও অন্যান্য ইতিহাসচেতনার পাশাপাশি এশিয়ার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকেন্দ্র, বল্লাল সেনের ঢিবি ও চাঁদ কাজির সমাধিস্থল, ভরতপুর কিংবা বরাবর গুহার অবস্থান, ক্যামেল ব্রিডিং ফার্মের মূল এলাকা, মাউন্ট আবুর পর্বত-পরিচয় প্রভৃতি ভূগোলবিদ্যাও বইটিতে আছে।

যাত্রাপথের কোনও কোনও অংশের পরিচয় ক্যুইজের মধ্যে দিয়ে পাঠকসাধারণের কাছে রাখা হয়েছে। চামোলি, গৌরীকুণ্ড বা গুপ্তকাশীর পথের ঠিকানা এভাবেই জানানো হয়েছে। কিছু কিছু রিসর্টের কথাও আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণস্থলগুলিতে যাওয়ার জন্য পরিবহন পদ্ধতি বর্তমান ভাড়া এবং নানা কিসিমের থাকার জায়গাগুলির খোঁজখবর জানিয়ে ক্যুইজ তৈরি করা গেলে সেগুলি ভ্রমণপিপাসুদের কাজে লাগত। তবু সামগ্রিকভাবে 'ভ্রমণ ক্যুইজ' একটি সময়োপযোগী প্রচেষ্টা। প্রচ্ছদটি সুন্দর, বইয়ের ভেতরে কিছু ছবি থাকলে আরও সুন্দর হত। পরিশ্রম করে প্রশ্নোত্তরগুলি তৈরি করে সুশোভন মলাটে উপহার দেওয়ার জন্য দিলীপবাবু পাঠকসাধারণের ভালোবাসা পাবেন।

ভ্রমণ ক্যুইজ, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশিকা প্রণতি চট্টোপাধ্যায়
৭ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলি
কলকাতা বইমেলা, ২০০৩, দাম ৫০ টাকা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ নিবন্ধ

গ্রামীণ শিল্প ও রবীন্দ্রনাথ

সুজিতকুমার বসু ও সুজিতকুমার পাল



সেকালের শিল্পভবনে গালার কাজ

বিশাল আমাদের এই দেশ, বিরাট তার জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার অধিকাংশেরই জীবন ও জীবিকা গ্রামভিত্তিক। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের উপর। বাস্তবিকপক্ষে গ্রামীণ শিল্পায়নকে পল্লি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের বিকল্প হিসাবে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে গ্রামীণ শিল্পায়ন যে কোনও দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়া উচিত। তাই আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যে কোনও দেশের পক্ষে বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। আমাদের মতো যে কোনও উন্নয়নকামী দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রামীণ শিল্প

গ্রামীণ শিল্পায়ন হল একগুচ্ছ পরিবর্তনশীল উৎপাদনের কার্যমাধ্যমের কৌশল। কর্মোদ্যোগের যান্ত্রিকীকরণ, নব নব শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস এবং গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগে উৎপাদিত নতুন নতুন দ্রব্য বিপণনের জন্য নতুন নতুন বাজারের সন্ধান এ সবকিছুই গ্রামীণ শিল্পায়নের কার্যমাধ্যমের অন্তর্গত। নতুন বাজার সন্ধানের জন্য নব নব ক্ষেত্র অধিগ্রহণের আগ্রাসী নীতিও এই কৌশলের অন্তর্গত। কাজেই গ্রামীণ শিল্পায়ন হল অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শহরমুখী হওয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি বিকল্প মাধ্যমমাত্র।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতিতে গ্রামীণ শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই শিল্প সাধারণভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের [KVIC] সংজ্ঞা অনুসারে গ্রামীণ শিল্প বলতে আমরা সেই শিল্পকেই বুঝি—যা এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে লোকসংখ্যা ১০,০০০ এর বেশি নয় এবং যা কোনও দ্রব্যের উৎপাদন বা পরিষেবা প্রদান করে বিদ্যুৎ বা শক্তির সাহায্যে বা সাহায্য ছাড়াই। এই শিল্পে মাথাপিছু কারিগর বা শ্রমিকের জন্য হাজার টাকার বেশি বিনিয়োগ হবে না। সম্প্রতি সরকারিভাবে গ্রামীণ শিল্পের সংজ্ঞা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ শিল্পের পরিসরও কিছুটা বর্ধিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুসারে, গ্রাম অথবা মফস্বল শহরে যেখানে জনসংখ্যা ২০,০০০ বা তার নিচে সেখানে ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে যন্ত্রাদি সহ পরিকল্পিত কারখানা স্থাপন করাকেই গ্রামীণ শিল্প বলা যেতে পারে।

গ্রামীণ শিল্পকে সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :—(১) কৃষিভিত্তিক শিল্প (Agro based industry) : (২) খনিজভিত্তিক শিল্প (Mineral based industry) ; (৩) বনজভিত্তিক শিল্প (Forest based industry); (৪) যৌগ রাসায়নিকভিত্তিক শিল্প (Polymer and Chemical based industry); (৫) যান্ত্রিক ও প্রথাবহির্ভূত শক্তিভিত্তিক শিল্প (Engineering and nonconventional energy based), (৬) বস্ত্রশিল্প (Textile industry) ও (৭) পরিষেবা শিল্প (Service industry)। এই শিল্পগুলির উন্নতিকল্পে সরকার একগুচ্ছ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে অনগ্রসর পল্লিসমূহে ও মফস্বল অঞ্চলে চাকরির সংস্থান ও আর্থিক সংস্থান—এই দুয়েরই প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রামীণ শিল্পায়ন প্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও মতবাদ আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতবাদের সঠিক অনুধাবনের আগে গুরুদেব যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও লালিতপালিত হয়েছিলেন তা আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই গ্রামীণ শিল্প ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে এক বিরাট ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। বংশপরম্পরায় কামার, কুমোর, তাঁতি, মুচি ও নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কারিগর ধাতু, চামড়া প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য তৈরি করে তখনকার দিনে সামাজিক চাহিদাগুলো মেটাতেন।

আমাদের দেশে যখন ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়েছিল তার কিছু আগেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপের উৎপাদক দেশগুলোর তৈরি সামগ্রী সস্তার ভারতীয় বাজারে হাজির হওয়ায় আমাদের গ্রামীণ শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিগুলি অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। আমরা সবাই ঢাকার মসলিন তাঁতিদের পরিণতির কথা জানি। বংশপরম্পরায় ব্যবসায় নিয়োজিত অনেক ব্যক্তিই ভয়ে তাঁদের ব্যবসা ত্যাগ করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটেছিল। তুলনামূলক কম খরচে বিদেশ থেকে উচ্চমানের আমদানিকৃত দ্রব্যসমূহকে ভারতীয়রা স্বাগত জানিয়েছিলেন। ঢাকায় তৈরি তাঁতির কাপড়ের তুলনায় ম্যাঞ্চেস্টারের মিলে তৈরি কাপড় ও স্বদেশে তৈরি মাটির অথবা লাক্ষার তৈরি খেলনার তুলনায় ইংরেজদের আমদানি করা পোর্সেলিনের খেলনা দেশবাসীর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য হয়েছিল। দেবদেবীর পটচিত্রের স্থান দখল করেছিল আধুনিক ছাপাখানায় মুদ্রিত সুদৃশ্য চিত্রসমূহ।

সমাজের ঐতিহ্যময় মূল্যবোধ ও প্রচলিত দেশীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদির এইভাবে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাঝখানে একমাত্র ঠাকুর পরিবারই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে ব্যতিক্রমী প্রতীক হয়ে অনড় পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহতি শিক্ষার ছত্রচ্ছায়ায় এই ঠাকুর পরিবার তাঁদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে স্বদেশি ভাষা, সংস্কৃতি ও দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যকে সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই স্বাদেশিকতা, সাহস, বদান্যতা ও আর্থিক সহায়তাতেই ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা'র মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী সম্ভব হয়েছিল। এই গ্রাম্যমেলা পরবর্তীকালে তেরো বছর প্রচলিত ছিল। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলায় কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এইসব প্রদর্শনীতে সুচের কাজ, ধাতুর অলঙ্কার, ব্যাগ, দেওয়ালে ঝোলানোর সুদৃশ্য ঝোলা অথবা চিত্র, বহুমূল্য হাতির দাঁতের কাজ, নবদ্বীপের মাটির মূর্তি, চামড়া ও কার্পেটের জুতো, হাতে তৈরি কাগজ, সাবান, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড়চোপড় ও আরও নানা ধরনের হাতে তৈরি সুন্দর সুন্দর জিনিস রবীন্দ্রনাথকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁরই নির্দেশ ও পরিকল্পনানুসারে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হস্তশিল্পের ওই সকল সুন্দর সুন্দর সৃষ্টিসমূহ তাদের সঠিক অবস্থানের নিশানা খুঁজে পেয়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে স্বাদেশিকের সভাতে একটি দেশলাই কারখানা স্থাপন করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত আর্থিক কারণে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায় ; কারণ একটি দেশলাই বাক্স তৈরি করার আনুমানিক যা খরচ তা তখনকার দিনে একটি গ্রামের সারা বছরের জ্বালানি খরচের প্রায় সমান। এছাড়াও আরও একটি সমস্যা ছিল দেশলাই কাঠিগুলো সরাসরি আগুনের সংস্পর্শে না এলে জ্বালানো যাচ্ছিল না।

মহর্ষিকৃত অছি দলিলের শর্তানুসারে জাতীয় ও গ্রামীণ শিল্প, শিল্পী ও কারিগরদের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে বার্ষিক পৌষ মেলা বা শীতকালীন মেলা আরম্ভ হয়েছিল। এছাড়াও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গুরুদেব দেশবাসীকে গ্রামে উৎপন্ন স্বদেশি জিনিস ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিলেন। তবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ উচ্চমানের হতে হবে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ দেশবাসীর গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেও সীমিত থাকতে হবে। গুরুদেব স্বয়ং তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'-র মাধ্যমেও এই বক্তব্যকেই উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই দূরদর্শিতা আমাদের আজকের ভারতবর্ষের গ্রামীণ শিল্পের পটভূমিকাতেও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও অনুভব করেছিলেন যে একমাত্র একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও সুদৃঢ় আদর্শই গ্রামীণ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই শিল্পের ক্রমোন্নতি, উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকৃষ্টমান ও চাহিদার উপর নির্ভর করবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনানুসরে যুগোপযোগী নতুন নতুন কাঁচামালের সরবরাহ ঘটিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এবং নতুন নতুন গ্রাহক ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি ও বিক্রয়ের বাজার তৈরি করে গ্রামীণ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে হবে। মহর্ষি তাঁর একটি দলিলে নব নব শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনানুসারে বিশ্বভারতীতে ওই বিষয়ে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতেও বিস্ময় জাগে যে আজ থেকে কত বছর আগে তিনি যে শুধু এই প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনাই করেছিলেন তা নয় ; তিনি প্রবন্ধক বিজ্ঞানের (Management Science) পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন। বাস্তবে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি ও স্থানীয় কারিগর এবং শ্রমিকদের সাহায্যার্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'ইন্ডিয়ান স্টোর্স' নামে দুটি দোকানও কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিলাইদহে থাকার দিনগুলি থেকে শুরু করে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত গুরুদেব লক্ষ করেছিলেন গ্রামের চাষিদের বছরের বেশির ভাগ সময়ই কোনও কাজ থাকে না। ফলস্বরূপ তাঁদের ক্রয়ক্ষমতাও খুবই সীমিত। তাঁর ধারণা হয়েছিল যদি এইসব কৃষকের মধ্যে বিশেষ কর্মদক্ষতা গড়ে তোলা যায় তবে তাঁদের দারিদ্র কিছুটা লাঘব হবে। কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষা সমাপ্ত করে আমেরিকা থেকে সদ্য আগত পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে পতিসরের কৃষক, যাঁদের কঠিন মাটি ছাড়া নিজের বলতে আর কিছুই নেই, কৃষির পাশাপাশি কোনও ধরনের শিল্পে তাঁদের নিয়োজিত করা যেতে পারে, সেই ব্যাপারে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। তিনি মৃৎশিল্প, ছাতা তৈরি অথবা ছাদের টালি প্রস্তুত করার মতো কুটিরশিল্পগুলির কথা ইতিমধ্যেই তাঁদের জন্য ভেবেছিলেন।

কিছু অভিজ্ঞ প্রশিক্ষককে এনে তাঁদেরকে কীভাবে এই শিল্পগুলি শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়, সে ব্যাপারে পুত্রের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামবাসীদের সাহায্যার্থে কবি গ্রামীণ শিল্পায়নে গভীরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁর যোগ্য সহচর ছিলেন এলমহার্স্ট। তিনি চর্ম সংস্কার বিদ্যায় পারদর্শী এক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষক হিসাবে এনেছিলেন। তাঁতের সাহায্যে রেশম বোনার সুদক্ষ কারিগর প্রশিক্ষক হিসাবে এসেছিলেন অসম থেকে। লাক্ষার কাজ, হাতে তৈরি কাগজ, কার্পেট বোনা, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ ও শাড়ি চিত্রণ ইত্যাদি শিল্পের জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল এখানে। ওইসব কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একজনকে তৎকালীন মাদ্রাজে বস্ত্রমুদ্রণ পদ্ধতি শিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল এখানকার কর্মীদের সেই বিদ্যায় পারদর্শী করার উদ্দেশ্যে। গ্রামবাসীদের গ্রামীণ শিল্পে উৎসাহিত করার জন্য তাঁদেরই উৎপাদিত জিনিস প্রদর্শনের জন্য একটি প্রদর্শনকক্ষ তৈরির কথাও গুরুদেব ভেবেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আলপনা, কাঁথার কাজ, গৃহকর্মে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প, ঝিনুক ও বাঁশের তৈরি জিনিসের নমুনা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহের জন্য এখানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই একজনকে ভার দিয়েছিলেন।

গুরুদেব জানতেন গ্রামীণ শিল্পে কতখানি আর্থিক লাভ হবে জানলে তবেই একজন কারিগর ওইসব কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করবেন। তাঁর চিন্তাভাবনা কতখানি বাস্তব ছিল তা ভাবতেও আমাদের বিস্ময় জাগে। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা থেকে তিনি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জানিয়ে বলেছিলেন, মানুষ সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে আনন্দ পায় আর এখানেই সে জীবজন্তু থেকে আলাদা ও উন্নততর। সৃজনশীল নান্দনিক জগৎ থেকে গ্রামবাসীরা বঞ্চিত ও নির্বাসিত। অথচ এই সৃজনশীল জগৎই তাঁদেরকে পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করতে পারে। তাই তিনি চাইতেন পল্লিজীবনের রুক্ষ ও শুষ্ক মরুভূমিতে সৃষ্টিশীল আনন্দের স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করতে। শুধুমাত্র অর্থের জন্য সৃষ্টিমুখী হওয়া নয় নিজেকে চেনা ও আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্যও সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি প্রকৃত অর্থে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সুফলের ভাগিদার গ্রামবাসীরাও। বাইরে থেকে নতুন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটানোই তাঁর কাম্য ছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটুক। গ্রামীণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার প্রারম্ভে তাঁর মনে হয়েছিল গ্রামবাসীরা এই শিল্পের মাধ্যমে যথাযথ লাভ অর্জনে সক্ষম হবে। পরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একমাত্র উন্নত ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে আখ পেষাই করে ও গ্রামে উৎপন্ন পাট গাঁট বাঁধাই করে গ্রামবাসীরা বেশি লাভবান হতে পারবেন। আবার সমবায় দুগ্ধ কেন্দ্রের মাধ্যমে গো প্রতিপালন করে ঘি ও মাখন উৎপাদন করে সস্তায় উৎকৃষ্ট জিনিস পাওয়া যাবে। ঠিক একইভাবে তাঁতিরাও যন্ত্রাদি কিনে বসিয়ে শ্রমদান করে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়ে লাভবান হতে পারেন।

বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করে তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। গুরুদেব উদ্ভাবিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাপ্রকল্পের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন। এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার পাঠিয়েছিলেন কৃষি ও দুগ্ধ সংরক্ষণশালা প্রকল্প বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য। এমনকী আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণের সময় রথীন্দ্রনাথের স্ত্রীও ওই একই বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ওইসব দেশে থাকাকালীন প্রতিমা দেবী কিছু কিছু হস্তশিল্প বিশেষ করে বই বাঁধাই ও মৃৎশিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি আন্দ্রে কার্পেলিসকে সঙ্গী করে শান্তিনিকেতনের কর্মশালায় হাতের জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। কয়েক বছর সংগ্রামের পর এই কর্মশালাই শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আর এই কর্মশালাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল শিল্পভবন অর্থাৎ গ্রামীণ হস্তশিল্প কেন্দ্র। এই ভবনে একে একে সংযোজিত হয়েছিল বাটিকের কাজ, বস্ত্র মুদ্রণ ও চিত্রণ, সুতো কাটা ও তাঁত বোনা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি। একসময়ে শিল্পভবনে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ, তার নকশা ও নিখুঁত নৈপুণ্যের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ক্রমশ ভারতে ও বহির্বিশ্বে এই সকল দ্রব্যের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ গুণী ব্যক্তির উদ্দীপিত তত্ত্বাবধানে রুচিসম্মত রঙ ও শিল্পসম্মত নকশায় কাপড় এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের পরিমার্জিত রূপের বিকাশ এখানে সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৩ থেকে ৩৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁতি সমবায় সমিতি স্থাপনের শুভ সূচনা ঘটে, যার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসা। ১৯৩০ সালের পর থেকে রথীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনকে নতুন করে ঢেলে সাজার উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবপর ঝুঁকি নিয়ে উল্লেখযোগ্য আয়ের পথও সুগম করার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই সময়ে চাকরি সংস্থান ও পরিবর্ত আয়ের পথ সুগম করার লক্ষ্যে শিল্পভবনের পরিকল্পিত পদ্ধতিগুলি আশপাশের গ্রামগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। এখনও আশপাশের গ্রামবাসীরা শিল্পভবনে (যা আজকের শিল্প সদন)-এ প্রশিক্ষণের জন্য আসেন। প্রশিক্ষণের শেষে এখানে অনেকেই এই কাজে নিযুক্ত হন অথবা নিজেরা ব্যবসা শুরু করেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সদনের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা নিজ নিজ গ্রামে সৃষ্টিশীল অথচ অর্থকরী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে তাঁর নিজের অথবা তাঁর গ্রামের উন্নতির জন্য দান খয়রাতি মঞ্জুর করা পছন্দ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রাম পুনর্গঠন এবং সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করলে তাঁরা সবাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবেন এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। 'Help people to help themselves' বাস্তবে তাঁর এই উপলব্ধি সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে National Programme of Community Development ও পল্লি সম্প্রসারণ প্রকল্প, শ্রীনিকেতনের গ্রাম পুনর্গঠন প্রকল্পকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং এখানকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, ধারণা, নকশা প্রণয়নের বিধিসমূহকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিল। বর্তমানেও গ্রাম পুনর্গঠনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী তার ধারণা ও আদর্শকে প্রয়োগ করার চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি।

কৃষিভিত্তিক শিল্প

ভারতের মতো উন্নতিকামী দেশের কাছে কৃষিভিত্তিক শিল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ কৃষি থেকেই আসে। ভারতের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশেরই আয়ের প্রাথমিক উৎস হল কৃষি। সত্তর ভাগেরও বেশি মানুষ কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজের উপর নির্ভরশীল। ভারতের তিন চতুর্থাংশ লোক বাস করে গ্রামে। পাশাপাশি আমেরিকা রাষ্ট্র, যুক্ত রাজ্য অথবা জার্মানির ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা হল ২ শতাংশ থেকে ২.৬ শতাংশ মাত্র। ভারতের Gross Domestic Product-এ কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজের অবদান ২৯ শতাংশ ; সেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নরওয়ে, অথবা জাপানে মাত্র ২ শতাংশ। ভারত তার এই বিশাল কৃষি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে



মৃৎশিল্পের কাজ চলছে

এবং কৃষিভিত্তিক নানারকম কর্মকাণ্ডের সাহায্যেই বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সমস্যার একটি হল বেকার সমস্যা ; বিশেষ করে সুপ্ত বেকার সমস্যা দিনের পর দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। তাই কৃষিভিত্তিক শিল্প আমাদের গ্রাম এলাকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করা যায় কেবলমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে। বৃহৎ আকারে গ্রাম এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করতে পারলে নিঃসন্দেহে খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের পরিবেশ গতিশীল ও প্রাণবন্ত রূপধারণ করে ঈপ্সিত সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারবে।

কৃষি ও শিল্পের মেলবন্ধন থেকেই কৃষিভিত্তিক শিল্পের উৎপত্তি। চাষি কৃষিভিত্তিক শিল্পে হয় চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, অথবা যন্ত্রাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন। এইসব উপকরণের মধ্যে বীজ, যন্ত্রাদি, গাছ সংরক্ষণের রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যেমন আছে, তেমনি আছে উপকরণ ও ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সঠিক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। যে সমস্ত শিল্প পদ্ধতি কৃষিজাত কাঁচামাল ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে তা কৃষিভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই পদ্ধতিগুলি হল চাল তৈরি, আটা ও ময়দা তৈরি, বস্ত্র শিল্প, চিনি, চা, পাট, কফি, কাগজ ও রবার উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ।

কৃষি শিল্প সংহতিতে শিল্পের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিতরূপে এই শিল্প গ্রামের কাছাকাছি স্থানে গড়ে ওঠা প্রয়োজন এবং কেবলমাত্র তখনই এই শিল্পে লব্ধ ফলসমূহের সুবিধা গ্রামবাসীরা সহজেই ভোগ করতে পারবেন।

চ্যালেঞ্জ ও কৌশলসমূহ

সরকার কৃষিভিত্তিক শিল্পকে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গ্রাম ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উভয়েই কৃষিভিত্তিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গ্রাম ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যেমন কৃষি ভিত্তিক শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে, ঠিক তেমনিভাবেই যে সকল পদ্ধতিগুলি গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোগ্য সেগুলি কৃষিভিত্তিক শিল্পেও প্রয়োগ করা যায়।

সাধারণভাবে যে কারণগুলি আমাদের দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পের অন্তরায় সেগুলি হল— আমাদের আর্থিক অপ্রতুলতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব এবং এই জ্ঞান কীভাবে লাভ করা যায় সে ব্যাপারে অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও পরিবর্ধিত পরিষেবার অভাব, পরিচালনার অভাব, মান যাচাইয়ের অভাব ও উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বেশি হওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপযুক্ত বাজারের সমস্যা, যোগাযোগ ও যানবাহনের অসুবিধা, নিত্যনতুন বাজারের সন্ধান করা, নিচু মানের কাঁচামাল, উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাব, অচল ও প্রাচীন প্রযুক্তিকে আঁকড়ে থাকা, সর্বোপরি রপ্তানি ও উন্নত পরিকল্পনার অভাব। নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করলে হয়ত এই অসুবিধাগুলি দূর করে গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

(১) ব্যবসার আধুনিকীকরণ ও পরিবর্ধিত প্রযুক্তিগত তথ্যসমূহ সম্পর্কে এই কাজে নিযুক্ত সকলকেই অবহিত করতে হবে। একইভাবে উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, উন্নত পরিচালন পদ্ধতি স্থির করা ও সেইসঙ্গে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

(২) যথাযথ পরিকল্পনা মাফিক কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

(৩) সময়মত পর্যাপ্ত মালের অভাব অথবা সাধ্যাতীত ক্রয়মূল্য গ্রামীণ শিল্পের অগ্রগতির অন্তরায় হতে পারে। কোনও গ্রামীণ শিল্প পরিকল্পনা গঠনের আগে এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

(৪) কখনও কখনও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনমত যন্ত্রাদি ক্রয় করবার অক্ষমতা গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে সরকারি প্রযুক্তিকেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে আধুনিক কার্যকরী যন্ত্রপাতি সুলভে ভাড়া পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিকেন্দ্রগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এমনকী এইসব কেন্দ্রগুলি উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করলে বিষয়টা আরও বেশি বাস্তবোচিত হবে।

(৫) উপযুক্ত গ্রামীণ সঞ্চয় ব্যবস্থার প্রসার ও সেইসঙ্গে সঞ্চয়কে স্থানীয় শিল্পে প্রগতির জন্য বিনিয়োগের সঠিক পরিকল্পিত কৌশল গ্রহণ করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন গ্রাম এলাকায় জোরদার মহতী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করা। NABARD এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের কাজ করে চলেছে। তবে প্রয়োজন হলে NABARD-এর সাহায্যার্থে একটি সম্পূরক অর্থকরী সমিতি গঠন করা যেতে পারে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Group) এক্ষেত্রে আদর্শ প্রকল্প। প্রযুক্তি তথ্যের সম্প্রসারণ যথাযথ গবেষণালব্ধ তথ্য ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (INFORMATION TECHNOLOGY) মুদ্রিত মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করা যেতে পারে।

(৬) গ্রামীণ শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য আশাবাদী হতে হলে সর্বস্তরীয় সার্বিক সহযোগিতার মনোভাবকে উন্নত করা প্রয়োজন।

বর্তমান ভারতের কৃষিসম্বন্ধীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত নিম্নে উল্লিখিত কার্যাবলি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে।

ঔষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদের চাষ : বর্তমানে স্বদেশে ও বিদেশে ভেষজ ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে নানা রকম ঔষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদের চাহিদা বেড়ে গেছে। পরিবেশ দূষণের ফলে ঐসব ঔষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদসমূহ দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপক চাষের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। প্রথাগত কৃষিভিত্তিক নিম্ন আয় পরিবর্তিত হয়ে উঁচুমানের চাষের প্রবর্তন সেইসব ব্যক্তির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাঁরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে আগ্রহী। যাই হোক, এই ধরনের চাষ শুরু করার আগে যাঁরা ভেষজ ব্যবহার করবেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের দ্বারা নির্দেশিত উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইসব উদ্ভিদ দূরবর্তী জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পাঠানো চাষিদের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে কিছু যন্ত্রাদি স্থাপন করে কার্যকরী উপাদানের নির্যাস নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বের করে নিতে পারলে এই চাষ থেকে লাভ বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ গ্রামীণ শিল্পে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঋতুকালীন ফল ও সবজি, উৎপাদনকালীন সময়ে ভালো বাজার দর পায় না, কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এইসব খাদ্য সামগ্রীকে যদি বিশেষ কিছু মুখরোচক খাবারে রূপান্তরিত করার প্রযুক্তি আয়ত্ত করা যায় তবে তা দীর্ঘদিন সংরক্ষিত করা যাবে। ফলে সঠিক বাজারদর পাওয়ার সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পথও সুগম হবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করার নানারকম প্রযুক্তিগত পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতি সমূহের বিষয়ে সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারলে স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে এই ব্যবসা চালানো সহজ হবে।

মাছ চাষ নানারকম গ্রামভিত্তিক কর্মোদ্যোগের মধ্যে মৎস্যচাষ অন্যতম। দুর্ভাগ্যবশত প্রচুর লাভ ও যথেষ্ট চাকরির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই বিভাগটি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সভা সাম্প্রতিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এই সত্যে উপনীত হয়েছে যে, আমাদের দেশের সমগ্র মৎস্য চাষের জলাশয়গুলির মাত্র ১৭ ভাগ বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতের মতো দেশে যেখানে ২ কোটি হেক্টর বিশুদ্ধ মাছ চাষের জলাশয় আছে সেখানে অবশ্যই যথেষ্ট আয় ও চাকরি সংস্থানের সুযোগও আছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ ধরনের লাল ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চলে অবস্থিত। এই ধরনের মাটিতে মৎস্য চাষের জলাশয়গুলিতে উৎপাদন খুবই কম ; কারণ জলের নিয়মিত অপ্রতুলতা ও মাটির কিছু বিরূপ বৈশিষ্ট্য। বিশ্বভারতীতে এই লাল ও ল্যাটারাইট মৃত্তিকা অঞ্চলে মৎস্য জলাশয়গুলির জন্য একটি সর্বাত্মক পুষ্টি বিধায়ক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্প সঠিক রূপায়িত হলে ঐসব জলাশয়ে উৎপাদন বাড়বে টনপতি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। শুধু তাই নয় এই প্রযুক্তি অনুর্বর অঞ্চল সমূহের মৎস্য উৎপাদনও বাড়িয়ে দেবে।

জৈবিক মিশ্র সার (Vermi Compost) স্বাধীনতার পর থেকে ভারত তার খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সাফল্য দেখিয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে যা ছিল মাত্র ৫৫ লক্ষ টন, নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় সেই লক্ষ্যমাত্রা দুশো আট লক্ষ টনে পৌঁছে গেছে। এই সাফল্যের একাধিক কারণগুলির মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। বর্তমানে রাসায়নিক সারভিত্তিক উৎপাদনের স্থায়িত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে জৈবিক সার প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মাটির উৎপাদন ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে নানারকমের জৈবিক সার ও উৎপাদন ও তার বাজারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সামান্য বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সার উৎপাদনের প্রচুর সুযোগ ও সুবিধাও রয়েছে।

আমাদের বর্জ্য পদার্থগুলিকে কেঁচো জাতীয় জীবের সহায়তায় চমৎকার একটি মিশ্র সারে পরিণত করা যায়। এই পদ্ধতিই হল Vermi Composting প্রযুক্তি। কৃষিভিত্তিক শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার সকল গুণাবলিই এই সারে আছে। কেঁচোরা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এদের পাচকতন্ত্রে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ একত্রিত হয়ে গৃহীত বর্জ্য পদার্থকে খুব কম সময়ের মধ্যে দ্রুত হজম করিয়ে দেয় ও জৈবিক মিশ্রসার হিসেবে বেরিয়ে আসে যা বহুগুণ সমৃদ্ধ। এটি বহু উৎপাদক নিয়ন্ত্রক ও জীবাণুনাশক গুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় শস্য উৎপাদনের প্রভূত উন্নতিতে সাহায্য করে। এই সার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেছে। এখানে এখন যে কোনও কর্মোদ্যোগীকে এই প্রযুক্তি দ্বারা সাহায্য করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রযুক্তির উন্নতি করার জন্য ও এতে উৎসাহিত করার জন্য বিশ্বভারতী কিছুদিন পর পর সংগঠক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করছে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই জৈবিক মিশ্র সারকে তার আয়ের উৎস হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন

যাঁরা এইসব সার প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক সেইসব কর্মোদ্যোগীদের কাছে অনেক ভালো ভালো উদ্দীপক প্রস্তাব তুলে ধরেছে। বৃহদাকারে এই প্রযুক্তি শুধু স্বদেশে ও বিদেশে জৈব সারের উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তাই নয়, সেইসঙ্গে বর্জ্য পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যাকেও হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

শিল্পায়নে বর্তমানে বিশ্বভারতীর ভূমিকা

এটা সত্যি যে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই কিছু না কিছু সাংগঠনিক গুণাবলি থাকে। এই সুপ্ত গুণাবলিসমূহ সঠিক পরামর্শ, কর্মোদ্যোগের স্থায়ী পরিকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আর্থিক সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে সক্ষম হয়।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে ভারতে এইসব সাংগঠনিক উদ্যোক্তাদের বিকাশের জন্য সরকারিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালেই উপার্জন সৃজন ও কর্মে নিপুণতা বৃদ্ধির জন্য গ্রাম এলাকায় এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে সুফলগুলি গ্রামবাসীরাও গ্রহণ করতে পারবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রীনিকেতনে পল্লিশিক্ষা ভবন ও পল্লি সংগঠন বিভাগ প্রাথমিকভাবে গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও শান্তিনিকেতনের কলাভবন, শিক্ষাভবন, বিনয়ভবনেরও গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে বড়ো রকমের অবদান আছে।

বিশ্বভারতী তার পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্রের মাধ্যমে আশেপাশের ৪৩টি গ্রামে ৩৯টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। সমস্ত পল্লি সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের ক্রমোন্নতি ও সাংগঠনিক উন্নতির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে গ্রামবাসীদের স্বনিযুক্তিতে উৎসাহিত করার মনোভাব নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে গ্রামগুলিতে শিবির স্থাপন করে দৃশ্য ও শ্রাব্য (audio-visual) মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। তাঁতবোনা, কাঠের কাজ, বাটিক, মৃৎশিল্প, বই বাঁধাই, চর্মশিল্প ও এই ধরনের আরও বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় কারিগরদের মধ্যে শৈল্পিক নমুনাসমূহ বিতরণ করা হয়—প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য। ব্যবহারিক কার্যক্রমে পাঠক্রম শেষ হওয়ার পর অধিকাংশ যুবকই সক্রিয়ভাবে কর্মোদ্যোগী হন। স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিবাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎপাদন বিভাগের দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকেন। পৌষ মেলা ও মাঘ মেলাতে প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র খুলে গ্রামীণ কারিগরদের উৎসাহিত করা হয়।

পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে গ্রামীণ মহিলারাও সমান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ওঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুটিরশিল্পের সঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের জন্য আরও একটি বিশেষ স্বনির্ভর কর্মসূচির সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে মহিলারা তাঁদের নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকরী, দীর্ঘস্থায়ী ঋণভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন যা তাঁদের প্রয়োজনীয় ঋণের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে।

এখানকার স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রধানত কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজের উপর নির্ভরশীল। গ্রামবাসীদের মূল ও সহযোগী আয়ের উৎস বাড়াতে উৎসাহিত করার জন্য প্রাণীজ সম্পদ উন্নয়ন ও সহযোগী কৃষিমূলক পেশাসমূহে বেশ কিছু সম্প্রসারণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা প্রয়োজনানুসারে সাহায্য করছে কৃষি উৎপাদন, দুগ্ধ প্রকল্প, মুরগি প্রতিপালন, মৎস্য চাষ, শূকর প্রতিপালন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রকে উন্নত করার জন্য। মানুষ এখানকার



কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিষেবাকেও গ্রহণ করেন বিভিন্ন ভাবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকার মান নির্ণয় করে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করতে শিখছেন তাদেরই কাছ থেকে। ফলে তাঁদের জীবনধারণের একমাত্র উৎস সেই কৃষির উন্নয়ন তাঁদের সামগ্রিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশ্বভারতীর মাধ্যমেই আশেপাশের গ্রামের কৃষকরা উন্নত মানের সবজি বীজ, বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছের কলম বা চারা, উন্নতমানের ধান এবং অন্যান্য শস্য চাষ শুরু করেছেন। চাষের পদ্ধতি সম্পর্কিত নিত্য নতুন গবেষণালব্ধ ফলের ব্যবহার কার্যকরী করা হয়েছে আশেপাশের অধিগৃহীত গ্রামগুলির চাষিদের মধ্যেই। উচ্চফলনশীল ধান বা অন্যান্য শস্য চাষের মাধ্যমে চাষিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তাঁরা স্বচেষ্টায় ওই ধরনের ভালো ফসল উৎপন্ন করতে পারে। ধানের বীজ, আখের কলম, পশুখাদ্য, গৃহসংলগ্ন সবজি ও ফলের গাছের চারা ইত্যাদি বিতরণও পল্লি সম্প্রসারণ কর্মসূচির একটি অঙ্গ। এর পাশাপাশি শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্যচাষ, জৈবিক সার, রেশমচাষ ইত্যাদি উন্নত চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া চাষিদের আলোচনা মঞ্চ, কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন, কৃষিজ ফসলের পরিদর্শন ও চাষি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমও সংগঠিত হয়েছে। ঔষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদের চাষের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের পুনর্গঠন এবং তাঁদের সমস্যাসমূহের সুসংহত সমাধান সূত্র প্রণয়নই ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন কর্মসূচির মূল কথা। ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্পের জন্য প্রচলিত ও বিদেশি শিল্পের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বিশ্বভারতী একদিকে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল বীজ, ভালো সার ও কীটনাশক দ্রব্যের উপর গবেষণা করে চলেছে ; অপরদিকে এইসব গবেষণা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান গ্রামবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে। প্রচলিত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির সেতু বন্ধনের মাধ্যমে উন্নত ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টাও হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বীরভূম জেলায় এমন কোনও শিল্প বা কলকারখানা নেই যা পরিবর্ত কর্মসংস্থান অথবা ভালো ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা খুঁজে দিতে পারে। বিশ্বভারতীর চেষ্টায় এখানে কৃষিজ উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, কুটিরশিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ স্থানীয় অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণ তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবা গ্রহণ, গবেষণা ও বিশ্বভারতীর শিক্ষামূলক বিভাগে যোগদানের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

লেখক পরিচিতি উপাচার্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকল্প আধিকারিক, পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, শ্রীনিকেতন।

বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর

প্রফুল্লকুমার পান

গত বছরটা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে খুবই তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দু-হাজারতিন খ্রিস্টাব্দটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। 'বর্ণপরিচয়' শব্দটা শুনে হয়তো কারো মনে খটকা লাগতে পারে, আর খটকা লাগাটাও স্বাভাবিক। কারণ বাংলা ভাষায় লেখা বর্ণপরিচয় বলতে আমরা একটি বইকেই চিনি। এই বইটির লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এটির রচনাকাল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। ওই বইটির প্রকাশ কাল ধরলে গত বছরটি হয় 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের একশত আটচল্লিশতম বছর। যাতে এই খটকাটা না লাগে তার জন্যই এই ভাবে বলি ২০০৩ সাল বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রকাশের দুশো পঁচিশতম বছর। সত্যিই আমাদের একাধারে গর্ব এবং আনন্দের বিষয় এই যে বাংলাদেশে ছাপাখানায় প্রথম যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল তা নামে গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ হলেও তা ছিল বর্ণপরিচয়মূলক। গ্রন্থটির নাম 'এ গ্রামার অফ্ দি বেঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ।' 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' অর্থাৎ ফিরিঙ্গিদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের শেষের দিকে।

এই দুশো পঁচিশ বছর ধরে ছাপাখানায় বাংলা ভাষায় বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ ছাপা হয়েছে অসংখ্য। এখনও ছাপা হচ্ছে কারণ বাংলা ভাষা আঞ্চলিক ভাষা ও ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডে চালু থাকলেও এ ভাষার বিবর্তন ক্ষমতা অসাধারণ। সেই বিবর্তন ক্ষমতা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় তেমন নেই। ফলে অনেক আঞ্চলিক ভাষা অবলুপ্তির পথে। কিন্তু বাংলা ভাষার বিবর্তন অব্যাহত। আর বিবর্তন ভাষার একটি প্রধান ধর্ম। ভাষা চলবে অথচ বিবর্তিত হবে না তা হয় না। ওই বিবর্তিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থগুলিও বিবর্তিত হয়। এবং বাংলা ভাষায় সেই বিবর্তনেরও একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। বাংলা বর্ণ পরিচয়মূলক গ্রন্থের বিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়ে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যায়, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের দেহগত আকারে অর্থাৎ হরফে, সংযুক্ত বর্ণের অবয়বে, বর্ণ সজ্জায়, বর্ণপরিচয় শিক্ষার পদ্ধতিতে এবং ভাষা সাহিত্যে এই বিবর্তনের ধারাটি গ্রন্থের লেখ্যরূপের মধ্যে দৃষ্ট হলেও ভিতরে ভিতরে কাজ করে দেশের সমাজ, পরিবেশ এবং যুগধর্ম ও ভাষা সাহিত্য। আবার বিশেষ করে যাদের উদ্দেশ্যে এই বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থগুলি রচিত হয় সেই সব শিশু অথবা বয়স্ক মেধা, মানসিক গঠন ও বয়সের উপর লক্ষ রাখতে হয় বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রণেতাদের। ফলে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থগুলির বিবর্তনও স্বাভাবিক।

বর্ণপরিচয় গ্রন্থের সন্ধানে

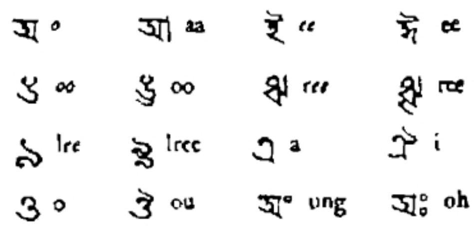
ছাপাখানায় প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থে হ্যালহেডও বর্ণ (Alphabet) এবং অক্ষর (Letter) এই শব্দ দুটিকে সমার্থক শব্দ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ)-এ গ্রন্থে বর্ণ এবং অক্ষর এই শব্দ দুইটিকে হ্যালহেডের মতো সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত 'শিশুসেবধি, বর্ণমালা' গ্রন্থে 'বর্ণ' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন গ্রন্থের আংশিক নামকরণে এবং বিষয়বস্তুতে। সম্ভবত বিদ্যাসাগরের পূর্বে একমাত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কারই বর্ণ এবং অক্ষর এই দুটি শব্দের প্রকৃতিগত এবং উচ্চারণগত পার্থক্য প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ' গ্রন্থে তিনিই পাকাপাকিভাবে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ 'বর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করলেন। তারপর বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থের শিরোনামে 'বর্ণ' সেই শব্দটিকে রেখে 'বর্ণপরিচয়' নামে প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ হিসাবে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সম্ভবত বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্ণ শব্দটি ব্যবহার করেন। এখন তো বাজারে বিভিন্ন নামে অসংখ্য বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যেমন—'আদর্শ লিপিধারা', 'বানান শিক্ষা', 'কিশলয় (প্রথম ভাগ)' 'সাক্ষরতার প্রথম ভাগ' ইত্যাদি। এমনকী আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশেও শিশুদের বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয় বিভিন্ন নামের গ্রন্থে। সেগুলিও মূলত বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ। যেমন—'আমার বই (প্রথম ভাগ)', 'শিশু সওগাত', 'আদি বাল্যশিক্ষা', 'আদর্শ লিপি', 'সরল বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। তবে বলা যায় বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের লেখা ও সরকারের তত্ত্বাবধানে বা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য বর্ণশিক্ষার গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থটি যেন আজও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। তবুও এখানে আমাদের এই আলোচ্যমান বিষয়টির ভিত্তি করা হচ্ছে ছাপাখানায় প্রকাশিত সওয়া দুশো বছর ধরে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থগুলির উপর।

বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন

প্রাচীন ভারতে হাতে লেখা অথবা পাথরে বা ফলকে খোদাই করা ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তিত রূপ হচ্ছে বাংলা বর্ণমালা। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার এই বিবর্তনের ধারাটি চলেছে। বিশ্বের প্রথম ছাপাখানা পঞ্চদশ শতাব্দীতে চালু হলেও আমাদের দেশে বাংলা হরফে লেখা ছাপাখানা চালু হয় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ আজ থেকে দুশো পঁচিশ বছর আগে। ছাপাখানা স্থাপনের পর অনেকের ধারণা ছিল বাংলা ভাষার হরফে এবার থেকে একটি সুষ্ঠু রূপ পাওয়া গেল। তাঁদের আরও ধারণা হল ব্যক্তিগত হাতের লেখায় হরফের যে পরিবর্তন হয় ছাপাখানায় বাংলা হরফে আর তেমন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা উল্টে গেল। খোদ ছাপাখানাতেই বাংলা বর্ণমালার যে বিবর্তন দেখা গেল তা বড়ো বিচিত্র। এখানে সেই বিবর্তনের ধারণাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ক) স্বরবর্ণের সংখ্যাগত বিবর্তন

সওয়া দুশো বছর ধরে ছাপাখানায় বাংলা বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য। সেইসব গ্রন্থে স্বরবর্ণের সংখ্যায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের গ্রন্থে স্বরবর্ণের সংখ্যা ছিল ষোলটি। কৌতূহলী পাঠকের জন্য তাঁর গ্রন্থ থেকে সচিত্র হরফটি তুলে ধরা হল নিচে। যেমন—



১৮৪৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা প্রথমভাগ' গ্রন্থে স্বরবর্ণের ওই সংখ্যা একই ছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' গ্রন্থে স্বরবর্ণের সংখ্যা দাঁড়াল বারোটি। যেমন—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ। উল্লেখ্য বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে প্রদত্ত স্বরবর্ণের তালিকায় পূর্বের তালিকা থেকে চারটি স্বরবর্ণ (যেমন ৠ ৡ অং আঃ) বাদ পড়ল। এখন আর এগুলিকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক স্বরবর্ণের তালিকায় রাখেন না। বিদ্যাসাগরকৃত এই স্বরবর্ণ সংস্কার করা সংখ্যাগুলি চালু ছিল প্রায় একশ পঁচিশ বছর ধরে। তারপর আবার সংখ্যাগত বিবর্তন দেখা গেল। ফলে সে বিবর্তন দৃষ্ট হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে প্রকাশিত 'কিশলয় প্রথমভাগ' (১৯৮১) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বাঙালির মুখে প্রায় অনুচ্চারিত একটি স্বরবর্ণ যেমন—'৯' বাদ দেওয়া হল স্বরবর্ণের তালিকা থেকে। ফলে স্বরবর্ণের সংখ্যা দাঁড়াল এগারোটি। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশ। সেখানে সরকারি ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা। বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'আমার বই' নামক বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থে স্বরবর্ণের সংখ্যাও রাখা হয়েছে ঐ এগারোটি।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাগত বিবর্তন

ছাপাখানায় প্রথম প্রকাশিত বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটি। হ্যালহেড থেকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সদস্য সংখ্যা ছিল একই অর্থাৎ ঐ চৌত্রিশ। বিদ্যাসাগরের আমলে ব্যঞ্জনবর্ণের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর বর্ণপরিচয় গ্রন্থে চৌত্রিশটির পরিবর্তে এই তালিকায় চল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান দেন। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাগত বিবর্তনে এই দুটি বর্ণ প্রকৃতিতে স্বরবর্ণ থেকে ভিন্ন বলে বর্ণ দুটিকে স্বরবর্ণের তালিকা থেকে তুলে এনে তিনি ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় রাখেন এবং 'ক্ষ' ('ক্' + 'ষ') এই বর্ণটি যেহেতু সংযুক্ত ব্যঞ্জন তাই এটিকে স্বরবর্ণমালার তালিকা থেকে বাদ দেন এবং পাঁচটি নূতন ব্যঞ্জনবর্ণ (যেমন ড় ঢ় য ং ৎ)-কে ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকায় সংযোজন করেন। ফলে বিদ্যাসাগরের হাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হল চল্লিশটি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'কিশলয় প্রথমভাগ' গ্রন্থে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ঊনচল্লিশটি। এই তালিকা থেকে অন্তঃস্থ 'ব' ব্যঞ্জনটিকে বাতিল করা হয়েছে। তার সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, এই বর্ণটির অবস্থান ভেদে উচ্চরণের বিভিন্নতা থাকলেও বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব' এই হরফ দুটির অবয়বে কোনো পার্থক্য নেই।

(গ) ছাপাখানায় বাংলা হরফের আকারগত বিবর্তন

বাংলা ছাপাখানা স্থাপনের পর থেকেই ভাবা হয়েছিল যে এবার থেকে অন্তত একই হরফে বাংলা ভাষা লেখা হবে। কিন্তু সেই একত্ব আর নেই। এই দুশো পঁচিশ বছর ধরে ছাপাখানায় যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় বাংলা হরফের বিরাট বিবর্তন। হরফের এই বিবর্তন কখনো হয়েছে সূক্ষ্ম ভাবে, কখনো বা স্থূলভাবে। আবার কখনো আমূল পরিবর্তন হয়েছে বাংলা হরফের। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হরফ উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে এবং সেই হরফগুলি আগে কেমন ছিল এবং এখন কেমন ভাবে লেখা হয় তার ব্যাখ্যা করাও যেতে পারে। স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণের হরফে যেমন বিবর্তন লক্ষ করা যায় তেমনি স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের সহযোগে অর্থাৎ যুক্তাক্ষরেও সেই বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন—

'অ'-এটি হচ্ছে এ যুগের সর্বাধিক প্রচলিত স্বরবর্ণের লেখ্যরূপ। এটির আকৃতি আজ যেমন দেখছি হুবহু তেমনটি ছিল না। এই চেহারায় বিবর্তনের ছাপ ধরা পড়ে। আজ এই স্বরবর্ণটি লেখার শুরুতেই একটি পুঁটলি বা ফুটকি বা স্থূল বিন্দু দিয়ে ডানদিক থেকে মোচড় দিয়ে সুন্দর অর্ধ গোলাকৃতি করা হয় বর্ণটির মাঝখানের ভূমিটিকে এবং বর্তমান ছাপাখানায় মাত্রার সঙ্গে ওই পুঁটলিটির মতো অংশটিকে যুক্ত করা হয় না বা কখনো যুক্ত করা হয়। হ্যালহেডের সময় মূল অংশটিকে মাত্র একটি দাঁড়ির মতো আঁকশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হত। কিন্তু আদিযুগে ঐ লিপিটির শুরুর সময় পুঁটলির মতো কোনো চিহ্নই থাকত না। এ ব্যাখ্যা বোঝা যাবে ছাপাখানায় প্রথম 'অ' স্বরবর্ণটিকে লক্ষ করলে। দেখুন হ্যালহেডের গ্রন্থে 'অ' স্বরবর্ণটি এরকম অ লেখা হত। অবশ্য এরকম চিহ্ন বা হরফ 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮) পত্রিকায় এবং ঐ সময়ের অনেক গ্রন্থে দেখা যেত। তবে 'সমাচার দর্পণ'-এর পর থেকেই 'অ' স্বরবর্ণটি একটু একটু করে গোলাকার হতে হতে বর্তমান আমলে এসে পড়েছে। সম্ভবত 'অ' এর ঝুলন্ত আঁকশিটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাধাকান্ত দেব মহাশয় ভেবেছিলেন যে দেবনাগরী হরফ अ থেকে বাংলা 'অ' এসেছে তাই তিনি 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২২) এ ছাত্রদের বর্ণপরিচয় শেখাতে গিয়ে 'অ' স্বরবর্ণটিকে লিখেছেন দেবনাগরী লিপির মতো अ। কিন্তু বাংলা 'অ' হরফটি যে দেবনাগরীর সাক্ষাৎ প্রভাবপ্রসূত নয়, তামিল লিপির সাক্ষাৎ প্রভাবপ্রসূত তা তামিলের 'অ' হরফ அটি দেখলেই বোঝা যায়। কারণ তামিলের அ-এর সঙ্গে বাংলায় 'অ' লিপির বেশ মিল আছে। উল্লেখ্য পুরানো বাংলা পুঁথিপত্রে যা লেখা পাওয়া যায় তাতে ওই মিল আরও স্পষ্ট। আর বাংলা টানা-হাতের লেখায় একসময় যে ভাবে 'অ' স্বরবর্ণটি লেখা হত তাতে তো চোখ বুজে বলা যায় বর্তমানে 'অ'টি তামিলের 'অ' এরই মত।

'উ' / 'ঊ'-বর্তমানের 'উ' / 'ঊ' হরফের সঙ্গে আগের হরফদুটির চেহারায় বেশ বিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে বিবর্তনটি মাত্রাঘটিত এবং মাত্রার ওপরের অংশের আকার ঘটিত। হ্যালহেডের আমলে 'উ' /'ঊ' স্বর দুটিকে লেখা হত উ / ঊ এইভাবে। এই হরফ দুটির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে আগে হরফ দুটির মাথায় মাত্রা ছিল না আর এখন যে চৈতন্যের মতো মাত্রার উপরে যে

চিহ্নটি দেওয়া হত তখন ঐ চিহ্নটি দেওয়া হত না, বরং উত্তর দক্ষিণে সামান্য চাপা অর্ধ বৃত্তাকার বা কোনো কোনো হরফে পূর্ণ গোলাকার একটি চিহ্ন আলতো ভাবে মাত্রা ছাড়াই সরাসরি হরফের মাথায় বসানো হত।

'ট'-হ্যালহেডের আমলে ছাপা ট এই ব্যঞ্জনবর্ণটিকে আজকের 'ট' বলে ভাবতে বেশ মুশকিল হয়। আগে 'ট' এর মাত্রাটি দেওয়া হত এখনকার 'ট' এর মতো মাথায় যে আঁকশিটি আছে তারও একেবারে উপরে এবং 'ট' এর ভিতরের মূল অংশটি ছিল গোলাকার। এখন গোলাকারের পরিবর্তে ভিতরের অংশটি বঁড়শির মতো আঁকড় দেওয়া হয়।

'ত'-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ু (উকার) এখন লেখা হয় 'তু' এরকম। কিন্তু হ্যালহেডের সময় 'তু' সংযুক্তবর্ণটিকে লেখা হত ত্ত এরকম। এইরকম হরফটি বিদ্যাসাগর ব্যবহার করেছেন এবং তার পরেও প্রকাশনায় এরকম ব্যবহার দেখা যায় কদাচিৎ। তবে বর্তমানে 'তু'টি ত্ত এরকম লিখলে অনেকেই আজ পড়তে পারেন না। আর যা পড়বেন তা হবে ত্ + ত্ অর্থাৎ ত্ত।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের হরফের বিবর্তনটাই বেশি হয়েছে। এই বিবর্তনের সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটিকে চেনাও আজ মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন—আজ 'ত্য' (ত্ + য) এই হরফের সঙ্গে হ্যালহেডের হরফের পার্থক্য অনেকটাই। হ্যালহেডের সময় 'ত' এ য-ফলা লেখা হত যে এইরকম। অনেকটা সংস্কৃতের এর মতো। এখন এই হরফটি একেবারে অচল।

(ঘ) স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসের বিবর্তন

সওয়া দুশো বছর ধরে প্রকাশিত গ্রন্থে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসেও বিবর্তন লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত বর্ণগুলির বিন্যাস করেছেন এইভাবে প্রথমে স্বরবর্ণ এবং পরে ব্যঞ্জনবর্ণের। এই বিন্যাসের অনুবর্তক হচ্ছেন হ্যালহেড, মনদমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ। আবার কেউ কেউ বর্ণমালার বিন্যাস করেছেন এইভাবে যেমন আগে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে স্বরবর্ণ। এই পদ্ধতির অনুসরণকারী হচ্ছেন উইলিয়াম কেরি, রামমোহন রায় প্রমুখ। এখানেই শেষ না। কেউ কেউ বর্ণগুলির আকৃতি অনুসারে যেমন ব ব ক ধ ঝ বিন্যাস করার পক্ষপাতী। এই অভিনব পদ্ধতিটি দেখা যায় 'লিপিধারা' গ্রন্থে। তবে 'লিপিধারা'য় গ্রন্থকারের কোনো নাম নেই। এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে লঙ্ সাহেবের Descriptive catalogue of Bengali works-এর তালিকায়।

বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থে স্বরবর্ণ আগে রাখা হবে কি ব্যঞ্জনবর্ণ আগে রাখা হবে তা নিয়েও বিতর্কের এখনো শেষ হয়নি। ১৯৪৯ সালেও বাংলা ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যাপারে তো পূর্ব পাকিস্থানের প্রস্তাব ছিল স্বরবর্ণের চিহ্নগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের ডানদিকে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে পরে স্বরবর্ণ বিন্যাসেরও।

তবে আধুনিককালে বর্ণগুলির বিন্যাস রক্ষিত হয়েছে বর্ণের ধ্বনিময়তা ও তাদের উচ্চারণ স্থানের পরম্পরা মেনে। কিন্তু আধুনিক ব্যাকরণের আবিষ্কার বর্ণমালার বিবর্তনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং করছে। তবুও আশংকা হয় আগামীদিনে আজকের বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা, হরফ এবং বর্ণগুলির ধ্বনি নির্ভর উচ্চারণ স্থানের পারম্পর্য ঠিক থাকবে কি না।

বর্ণপরিচয় শিক্ষার বয়স ও শিক্ষা পদ্ধতি

শিশুদের বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাটি খুব একটি নতুন ব্যাপার নয়। মধ্যযুগ থেকেই এ ব্যবস্থা চালু ছিল। তার প্রমাণ মেলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বিখ্যাত কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ 'শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ' নামক অধ্যায়ে, কিন্তু সে সময় কেমন করে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হত সেরকম পদ্ধতি বিষয়ক কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ বা নথিপত্র বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়নি। অথচ ওই বর্ণনায় বলা হয়েছে 'পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার ফলা' অর্থাৎ অসংযুক্ত বর্ণশিক্ষার পরে 'আঠার ফলা' মানে সংযুক্ত বর্ণশিক্ষা দেওয়া হত সে সময় তবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে শিশুদের কী পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ দেওয়া যায়-এ সম্বন্ধে নানা পদ্ধতি আলোচিত হয়। সে আলোচনা হয়েছে ইউরোপীয় ভাষায়। উল্লেখযোগ্য দুজন আলোচক হচ্ছেন সুইডিস পণ্ডিত জোহান হাইনরিখ পেস্তালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) এবং জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিখ উইলহেলম আগস্ট ফ্রোয়েবল্ (১৭৮২-১৮৫২), তাঁদের লেখা আমাদের বাঙালিদের কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত।

আমাদের দেশে শিশুদের বর্ণপরিচয় বিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি থাকলেও শিক্ষা পদ্ধতি বা কী জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করলে বা কি জাতীয় গ্রন্থ রচনা করলে শিশুদের আকর্ষণীয় হবে সে সময় সে জাতীয় নির্দেশক পুস্তক ছিল না। তবে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে লক্ষ করা যায় যে দুশ পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশিত গ্রন্থে লেখকদের মননে অলিখিতভাবে শিক্ষার বয়স শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল। আজ পর্যন্ত সেইসব পদ্ধতির একটি রূপরেখা টানা যেতে পারে।

প্রথমেই শিশুশিক্ষার প্রথমপাঠ গ্রহণের বয়সের কথায় আসা যাক। কারণ শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার বয়সসীমার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগে সাধারণত শিশুদের বর্ণপরিচয়মূলক শিক্ষা দেওয়া হত 'হাতে খড়ি' দেওয়ার পর। তাই সন্দীপন মুনির কাছে কৃষ্ণ বলরামের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। সেখানে এরকম একটি বর্ণনা দেওয়া আছে যেমন, 'হস্তে খড়ি ধরলেন কৃষ্ণ বলরাম' অর্থাৎ এই 'হাতে খড়ি' দেওয়ার বয়স সম্ভবত পাঁচের কম ছিল না। উল্লেখ্য, প্রাচীনকাল থেকে শিশুদের লালন পালনের বয়স নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ বছর পর্যন্ত। সেখানে বলা হয়েছে 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি' অর্থাৎ শিশুদের পাঁচ বছর ধরে তাড়না করা হত এবং শিশুশিক্ষা শুরু হত পাঁচের পর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময় সম্ভবত শিশুদের প্রথম পাঠারম্ভের বয়স আরো কম নির্ধারিত হয়েছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজপাঠের প্রথম বাক্যটি লিখেছেন

'ছোট খোকা বলে অ আ
'শেখেনি সে কথা কওয়া।'

অর্থাৎ কথা বলতে শেখার আগেই শিশুর বর্ণপরিচয়ের পাঠ শুরু হয়ে যেত। এরকম শিশুর বয়স নিশ্চয়ই পাঁচের কম। এখন অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংস্থা থেকে বলা হয়েছে পাঠশালায় শিশুদের ভর্তির বয়স হতেই হবে পাঁচ প্লাস। কারণ 'শিশুর প্রথম পাঠনা পুস্তক' (১৮৬২) নামক গ্রন্থে শিশুশিক্ষার বয়স সম্বন্ধে পাদ্রি রেভাঃ বোম্ওয়েচ সুপারিশ করে বলেছেন, অনুচিত সময়ে শিশুর প্রথমপাঠ আরম্ভ করলে লেখাপড়ায় শিশুদের আকর্ষণ থাকে না।

এবার বর্ণপরিচয়-শিক্ষার-পদ্ধতির কথায় আসি। প্রথমে শিশু শিক্ষার্থীকে নিরাভরণ বর্ণমালা শেখানো হত। তারপর ফলা বানান

অর্থাৎ যুক্তাক্ষর শেখানো হত। এই নিরাভরণ বর্ণমালা শিখতে শিশুর সময় লাগতো অনেক বেশি। তখন ছিল বর্ণক্রমিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিশুকে তাদের মতো মুখস্থ করতে হত। উচ্চারণ স্থান অনুসারে বর্ণগুলি সাজানো হত। ফলে ব্যাকরণের রীতি মেনে উচ্চারণ করার ফলে শিশুদের মেধার উপরে অযথা চাপ পড়ত। তারপর শিশুকে শিখতে হত রাশি রাশি শব্দকদম্ব। এসব বিচিত্র শব্দ একসঙ্গো চোখে দেখে এবং কণ্ঠস্থ করে তার রূপ ও ধ্বনি এই দুই বিষয়কে শিখতে হত। ফলে অনেকেই তা পারত না। সেই মুখস্থ দুরূহ শব্দ দিয়ে তাদেরকে বাক্য গঠনের কলাকৌশল শেখানো হত। এই পদ্ধতি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে) গ্রহণ করে 'শিশুসেবধি, বর্ণমালা' নামে শব্দ বানান (Spelling Book) গ্রন্থ রচনা করেন।

কিন্তু মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুদের বর্ণপরিচয়-শিক্ষার পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনিই আধুনিক শিশুশিক্ষা পদ্ধতির প্রথম পথিকৃৎ ও রূপকার। তাঁর বন্ধুবর বিদ্যাসাগর এই পদ্ধতির কিছুটা অনুবর্তক। অনুবর্তক বললাম এই জন্য যে তিনিও মদনমোহনের মত শব্দ বানান পদ্ধতিতে ধ্বনিময়তার সঞ্চার করেছেন। এই ধ্বনির উপর ভিত্তি করে অকার-আকার প্রভৃতি দিয়ে বর্ণের লিপিরূপ শেখাতে লাগলেন। কারণ শিশুরা ধ্বনির ব্যাপারে খুব সজাগ। এই পদ্ধতিতে শব্দার্থ উপেক্ষিত হল। অবশ্য ছন্দ ও মিলের যোগে নিরলংকৃত ভাষা শিক্ষার যে প্রয়াস তা প্রথম দেখালেন মদনমোহন। বর্ণশিক্ষার পরই তিনি লিখলেন, 'কর কর / খর খর' ইত্যাদি। এসব শিশুপাঠে অর্থ শেখানো যে নিরর্থক এবং তা শিশুর স্মৃতির উপর চাপ সৃষ্টি হবে তা মদনমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও জানতেন বলেই বর্ণপরিচয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপনও তিনি লিখলেন, 'অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না।' অবশ্য বিদ্যাসাগর শব্দ বানান বিন্যাসে ছোটো-মাঝারি-বড়ো, বা বড়ো-মাঝারি-ছোটো এরকম বৈজ্ঞানিক অথচ শৈল্পিক ক্রম রক্ষা করেছেন। তারপর শব্দ কদম্ব থেকে পরিচিত শব্দ নিয়ে ছোট ছোট বাক্য তৈরি করার শিক্ষা দিয়েছেন। এবং অনুচ্ছেদ লেখার পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। একথায় বলা যায় দুই বন্ধুর গ্রন্থেই শিশু শিক্ষার্থীর জন্য বর্ণপরিচয়, শব্দ বানান শিক্ষা, একাধিক শব্দ দিয়ে ছোটো ছোট সরল বাক্য গঠন, আবার সরল বাক্য থেকে ক্রমে ক্রমে জটিল ও যৌগিক বাক্য তৈরি করে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অনুচ্ছেদ রচনার শিক্ষার অভিনব পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়েছে।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিশুদের প্রথম শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বাংলা ভাষায় দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। এ পুস্তিকা দুটি হচ্ছে পাদ্রি রেভাঃ বোমওয়েচ-এর 'শিশুর প্রথম পাঠনা পুস্তক' (১৮৬২) এবং 'পাঠনা প্রণালীর প্রদর্শিকা' (১৮৬৩)। এই পুস্তিকা দুটির প্রত্যেকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। পুস্তিকা দুটি আকারে খুব ক্ষুদ্র হলেও পরবর্তী লেখকদের অনেকটা দিগদর্শন দিয়েছিল। এখানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে শিশুরা পাঠে মনোনিবেশ করতে ভালোবাসে না কারণ তাদের মনের বিপরীত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেকটা শিশুদের সেই মানসিকতা ধরতে পেরেছিলেন। তাই 'সহজপাঠ' লেখার লক্ষ্য ছিল শিশুর মনের মতো ছন্দ ও মিলের সঙ্গো সংগতি রক্ষা করে শিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন ধারার প্রবর্তন করার। এই পদ্ধতিতে সাহিত্যরসের আস্বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে. এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন বলেই আজও একাত্তর বছর ধরেই তাঁর 'সহজপাঠ' শিশুদের কাছে অতিপ্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি জ্ঞাপক 'কিশলয় প্রথমভাগ' (১৯৮১) এবং 'কিশলয় সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৮১) নামে দুটি বর্ণ পরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানে যে পদ্ধতিটি আছে তাকে বলা যেতে পারে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি। শিশু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যখন আসে সে দুটি মৌলিক সামর্থ্য নিয়ে আসে। মৌলিক সামর্থ দুটি হচ্ছে শ্রবণ আর কথন। এই সামর্থ দুটির লক্ষ্য হচ্ছে ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা আর প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করা। তাই শিশুর অতি পরিচিত বাক্য দিয়ে বর্ণপরিচয়ের পাঠ শুরু হয়। ফলে সহজেই শিক্ষার্থী বর্ণমালার সাধারণ বর্ণসমূহ এবং সংযুক্ত বর্ণগুলি শিখতে পারে। বাক্যের মধ্যে থেকে বিশেষ একটি পদ বেছে নিয়ে এবং ভেঙে যে কোনো বর্ণ শিশুকে শেখানো যেতে পারে। তাতে অ, আ, ই এইক্রম কেন? যে কোন বর্ণকে শিশুর সামনে প্রথম তুলে ধরার পর বর্ণপরিচয়ের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'দই' যদি শিশুর প্রিয় হয় তাহলে 'দই' দিয়ে একটি বাক্য রচনা করে 'দই' শব্দটিকে ভেঙে প্রথমে 'দ' শেখানো যেতে পারে। এবং পরে 'ই' শেখানো যেতে পারে। এবং পরে 'ই' শেখানো যেতে পারে বর্ণপরিচয়ের এই পদ্ধতিটি চলছে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটি চালু আছে।



